প্রণয়-তৃষা

প্রণয়-তৃষা

এমিলি জোলা

হাউস অব বুকস্
৭২, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা—৯

প্রকাশক—
শ্রীসত্যেন মুখোপাধ্যায়
৭২, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা—৯

অনুবাদক—
শ্রীগিরীন চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
শ্রীরাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—
শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল
নবগৌরাঙ্গ প্রেস
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

মূল্য দু'টাকা আট আনা

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের মধ্যমণি পারী শহরে ১৮৪০ খৃঃ জন্ম হয় সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এমিলি জোলার। তাঁর পিতার রক্তে ছিল ইতালীয় ও গ্রীক রক্তের মিশ্রণ; মা ছিলেন ফরাসী মহিলা। ভাবী লেখকের জীবন গড়ে ওঠে এইক্স (Aix) শহরে।

১৮৫৮ সালে তিনি ফিরে আসেন পারীতে। তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। তারপর ১৮৬৯ খৃঃ কেরাণীবৃত্তি ছেড়ে সাহিত্য চর্চায় মন দেন। তারপর শুরু হয় বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস সমূহের বন্যা।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি হল কুড়িটি উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় সমৃদ্ধ রুগোঁ মাকার্ত (Rougon Macquarts)। এরই একটি খণ্ডের সঙ্গে বাংলার পাঠক কুলের পরিচয় হল 'নানা'র মারফৎ।

১৮৬৭ সালে প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই থেরেসা (থেরেস রাকুয়াঁ) পাঠকদের চিত্তজয় করে নিয়েছিল। পরে এটিকে জোলা নিজেই নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় সে নাটক অভিনীত হয়েছে।

১৯০২ সালে জোলা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আলফ্রেড ড্রিফাসের বিশ্ববিখ্যাত মামলার যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে জোলারও কর্মব্যস্ত জীবনের ঘটে অবসান। তাঁর সমাধিস্থানে দাঁড়িয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেছিলেন,

"মানুষের চলমান বিবেকস্রোতের একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিলেন তিনি।"

বিগত শতাব্দীর শেষাংশ হল ইউরোপের বুকে বুর্জোয়া বা ধনতন্ত্রী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুগ। ধনতন্ত্রী সমাজের দূষিত, গলিত দিকের প্রতি আঙুল দেখিয়ে অকপটে যে ক'জন সাহিত্যক নিজেদের ঘৃণার রসে জাড়িত করে গেছেন উত্তর কালের সাহিত্য তাঁদের পুরোধা হলেন জোলা। জীবনে যেমন ছিলেন তিনি বিদ্রোহী মৃত্যুর মধ্যেও রয়েছেন তেমনি অমর।

এক

নদীর ধারে মালখালাসের ডকগুলো একে একে পেরিয়ে রু গুয়েনেগ' দিয়ে আনমনে চলতে থাকলে কখন এসে পড়বে আলো-আঁধারি সরু এক ফালি রাস্তার মত গাড়ী-বারান্দার নীচে—রু মাজারিন থেকে রু দি লা সীইন পর্যন্ত বিছানো। চলার মাপে বড় জোর তিরিশ পা লম্বা আর দুপা চওড়া। ক্ষয়ে-যাওয়া পীতাভ পাথরের আস্তরণ তার বুকে। তাও মাঝে মাঝে গেছে ভেঙে; আর সেই ভাঙা-ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে উঠছে গন্ধ—বিষাক্ত, টোকো গন্ধ। বারান্দার ওপরের কাচের ঢাকনীর চৌকো চৌকো কাচগুলিও আঁটালো ধূলোয় বিবর্ণ মলিন। এরই নাম পাসাজ দু পুঁ ন্যু।

গ্রীষ্মের খররৌদ্রে পথঘাট যখন যায় ঝলসে তখন ঐ মলিন কাচ ফুঁড়ে স্তিমিত আলোর রেখা বেরিয়ে পাসাজ-এর আঁধার ঈষৎ পাতলা করে দেয়। শীতের সময় আবহাওয়া যখন ভারী থাকে সেই কুয়াশায় ঘেরা সকালে কাচগুলো থেকে আঁধারেরই ঝলক পড়ে ঠিকরে ঐ পংকিল রাস্তামোড়া-পাথরগুলির ওপর। মনে হয় কুৎসিত বীভৎস রাতের পরশ নেমেছে তার বুকে!

বাঁয়ের অল্প আলোয় সংকীর্ণ নীচু ঘরগুলিতে মাটির নীচের ভ্যাপসা সোঁদালো গন্ধ। তারমধ্যে যত পুরানো বই, খেলনা আর কার্ডবোর্ডের দোকান। পসরাগুলো ধূলোমলিন, যেন ঝিমুচ্ছে সেই অস্পষ্ট-আঁধারে। দোকান ঘরের ছোট ছোট জানালা দিয়ে ভেতরের জিনিসপত্রের ওপর কত অদ্ভুত ছায়া পড়ছে বাইরেকার। তাদের পেছনে অন্ধকার গুহার ছায়ার মত দেখায় দোকানের সারি—আর তার ভেতর চলাফেরা করছে যত কিম্ভূতকিমাকার জীব।

পাসাজ-এর ডানদিকের সবটা জুড়েই লম্বা দেয়াল। পথের ওপরে দোকানদাররা সাজিয়ে রয়েছে সরু সরু শো-কেস। ক্যাট্‌কেটে বাদামী রঙ ল্যাপটানো হাড় জিরজিরে শেলফ্‌গুলোর ওপর দেখবে বতরাজ্যের অনামী আর বিস্মৃতপ্রায় জিনিসের আণ্ডিল। এরই মধ্যে একটি মেয়ে, নকল জহরতের পসরা নিয়ে বসে। সবচেয়ে সস্তা আংটি মেলে তার কাছে। মেহগিনী কাঠের বাক্সে নীল ভেলভেটের মধ্যে গাঁথা থাকে সেটি সযত্নে।

কাচের ছাদ ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে দেয়াল—যেমন কালো তেমনি চটাওঠা! পলেস্তারা দেখায় গলিত কুষ্ঠরোগীর মত বীভৎস—সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন।

পাসাজ তু পঁ ন্যু বেড়াবার জায়গা নয় মোটেই। ঘুরে না গিয়ে এদিক দিয়ে গেলে কয়েক মিনিট সময় বাঁচে মাত্র। সোজাসুজি যদি কেউ কোথাও তাড়াতাড়ি যেতে চায় সেই সব ব্যস্ত সমস্ত লোকরাই শুধু লাফেরা করে এই পথে। এখানে নজরে পড়ে এ্যাপ্রণ-পরা শিক্ষানবিশ হাতের কাজ বয়ে নিয়ে চলেছে দর্জী-বউ, কোল-জোড়া মালপত্তর নিয়ে মেয়ে-পুরুষের ভীড়; কখনো কখনো বুড়োরাও ধুঁকতে ধুঁকতে চলেন সেই আবছা-আঁধার পথে—কিংবা যত স্কুল-ফেরতা ছেলের দল পাথরের ওপর দৌড়োদৌড়ি করে কাঠের জুতার আওয়াজে ভরিয়ে তোলে চারদিক। সারাদিন সেই পাথরে খট্‌খট্‌ আওয়াজ হচ্ছে—বেতালা দ্রুত পায়ে চলার শব্দ—বিরক্তি জন্মে যায় সেই বিশৃঙ্খল শব্দে। কেউই কথা বলে না, কেউ থামেও না। সবাই ছুটে চলেছে কাজে। ঘাড় হেঁট করে—দোকানগুলোর দিকেও যেন তাকাবার ফুরসৎ নেই। তারই মধ্যে দৈবাৎ কেউ সাজানো পসরার সামনে এসে থামলে দোকানীরা অসোয়াস্তির সঙ্গে তাকায় তার দিকে।

রাত্তিরে চৌকাচৌকো ভারী লণ্ঠনে মরথ্যে দিয়ে তিনটে গ্যাসবাতি

জ্বলে পাসাজ-এ। কাচের ডোমে ঝোলানো গ্যাসবাতিগুলির ম্লান আলোর ছোপ লাগে সেই ডোমের ওপর ; আর নীচের রাস্তায় এসে পড়ে মিটমিটে বিবর্ণ আলোর রেখা—এটু আছে, এই যেন মিলিয়ে গেল আবার। তখন পাসাজটিকে মনে হয় মরণ-ফাঁদের মত। বড় বড় ছায়া পড়ে পাথরে আর রাস্তা থেকে স্যাঁতসেঁতে হাওয়ার ঝাপটা লাগে গায়। মনে হয় দাঁড়িয়ে আছি মাটির নীচে কারও স্বল্পালোকিত সমাধির ভেতর ; শেষকৃত্য করতে এসে যে তিনটে দীপশিখা রেখে গেছে সবাই তাই শুধু জ্বলছে মিটিমিটিয়ে। গ্যাসের মৃদু আলোয় চলে জানালার কাজ, আর ভেতরে, কাউণ্টারের পেছনে বসানো একটি ঘেরাটোপ দেওয়া বাতি। তাতেই পথযাত্রীদের বুঝে নিতে হয় সেই দিনের বেলায় রাত-আঁধারের ভেতরে কি আছে সাজানো। দোকানের সারির সামনেকার কালোছায়া ভেদ করে ফুটে উঠেছে একটি কার্ডবোর্ড বিক্রেতার জ্বলজ্বলে জানালাটা ; ছুটি কেরাসিন তেলের বাতির পীতাভ রশ্মি দেখা যায় সেই ঘনকৃষ্ণ আঁধারে। অন্যদিকে বাতিদানে বসানো মোমবাতির আলো ঠিকরে পড়ছে ভেতরে সাজানো যত নকল জহরতের বাক্সের জিনিষের ওপর।

এ দোকান পেরিয়ে একটু এগোলেই একটা দোকান দেখা যেত কয়েকবছর আগে। তার সবুজ আসবাবপত্তরের ফাটল থেকে বেরোত স্যাঁতসেঁতে ভাপ। মোটামোটা হরফে তার নাম লেখা, **পরিধেয়,** আর একটি জানালার কাচে লাল রঙে লেখা একজন মহিলার নাম—থেরেসা রাকুঁআ। ডাইনে বাঁয়ে নীল কাগজে মোড়া জানালা পড়ে নজরে।

দিনের বেলা ছবিতে আঁকা আলো-ছায়ার মেলার মত দেখায় সাজানো পসরাগুলো।

একদিকে কিছু পোষাক, দু তিন ফ্রাঁ দামের একটা ওড়না, মসলিনের কলার আর কাফ, তারপর খেলার জার্সী, মোজা—এইসব। জিনিসগুলো কোনও রকমে ঝুলছে তারের সঙ্গে কেমন লাট হয়ে গেছে। রং হয়েছে

হলদে। জানালার আগাগোড়াই এইসব সাদা ছেঁড়াখোড়া পোশাক দিয়ে ঠাসা। তাতেই ঘরের পরিবেশ করে তুলেছে আরও ম্লান। ধোয়া নতুন নতুন ওড়নাগুলো ঝকমক করে নীল কাগজে মোড়া বোর্ডগুলোর ওপর। মসলিনের সাদার জোয়ারের পাশে লম্বা কাঠিতে সাজানো রং-বেরঙের মোজার ভিড় দিচ্ছে তাতে চাপা রঙের ছোপ বুলিয়ে।

আর এক দিকের সরু জানালায় সবুজ উলের বড় বড় লাচি, সাদা কাগজের উপর কালো কালো বোতাম, হরেক রকমের ও রঙের বাক্স, চকমকি লাগানো খোঁপার জাল, সেলাই-করার ছুঁচ, এম্ব্রয়ডারীর প্যাটার্ণ, রিবনের বাণ্ডিল, সব যেন বছর পাঁচেক ধরে ঝিমুচ্ছে সেই কালিমায়! ভ্যাপসা স্যাঁতসেঁতেনী আর ধূলো-বালিতে আসবাবপত্তরগুলো যেমন নষ্ট হয়েছে তেমনি পোশাকপরিচ্ছদের রঙও গেছে জ্বলে।

গ্রীষ্মের তপ্তদুপুরে পথঘাট যখন খাঁখাঁ করে তখন পাশের জানালার ধারের ওড়নাগুলোর পিছনে দেখা যায় একটি তরুণীর প্রোফাইল— মুখাকৃতির একটি পাশ। তার নম্র কপালের রেখা এসে মিলেছে টিকোলো নাকের মূলে; ঠোঁটদুটো দেখায় বিবর্ণ গোলাপী রেখার মত; হ্রস্ব থুৎনীর চাঞ্চল্য এসে নেমেছে কম্বুগ্রীবার মধুর মসৃণতায়। অবয়ব মিশে গেছে আঁধারে—নজরে আসে না। শুধু মড়ার মত ফ্যাকাশে প্রোফাইল ফুটে দেখা যায় ঝুমকো কালো চুলের রাশির ভেতর থেকে একটি অতন্দ্র গহন কালো চোখ। প্রোফাইলটি ঐ খানে নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দুপাশে দুটি বনেট ঝোলে কাঠের লাঠি থেকে!

রাত্তিরে আলো জ্বালা হলে দোকানের ভেতরটাদেখা যায়। আড়ের চেয়ে পাশে অনেক বড় দোকানটি। একপাশে ছোট্ট কাউণ্টার, অন্য পাশে ঘোরানো সিঁড়ি চলে গেছে উপর তলায়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো জিনিস পত্তরের আলমারী, কার্ডবোর্ড, সারিবাঁধা সবুজ কার্ড-বোর্ডের বাক্স। চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল—এই হল মায়

সরঞ্জাম। কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায় জায়গাটা—কাগজের পোঁটলায় মোরা মোজার স্তূপ জমানো কোণায়।

সাধারণতঃ দুজন মহিলা বসতেন সেখানে। গম্ভীর তরুণী ও একজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধা মহিলার বয়স হবে ষাটের কোঠায়, বাতির আলোয় ফোলা-ফোলা মুখ দেখায় ফ্যাকাশে সাদা। কাউণ্টারের এক কোণায় কুঁকড়ি শুকড়ি মেরে রয়েছে একটা হুলো বেড়াল—নজর রয়েছে ঝিমন্ত বৃদ্ধার উপর।

একটু পেছনে বছর তিরিশের একটি তরুণ চেয়ারে বসে তরুণীটিকে যেন কি বলছে কি কিছু পড়ে শোনাচ্ছে। আকারে ছোট, ক্ষীণকায়, চাঞ্চল্যের ছাপ চোখে মুখে। পাট করা সুন্দর চুল, ঈষৎ দাড়ি আর ব্রণের দাগে ভরা মুখ দেখে বয়াটে রোগা ছেলে বলে মনে হয়।

দশটার একটু আগে বৃদ্ধার তন্দ্রা ভাঙল। দোকান বন্ধ করে তখন পরিবারের সবাই চলে গেল উপরে। তাদের পিছনে সিঁড়িতে গা ঘষতে ঘষতে এলো হুলো বেড়ালটা।

ওপর তলায় তিনখানা ঘর। নীচের সিঁড়ি এসে ঠেকেছে খাবার ঘরে। সেটাই পরে রূপান্তরিত হয় শোওয়ার ঘরে। বাঁয়ে একটু উঁচু আলিসায় ষ্টোভ বসানো। পাশেই ছোট জলচৌকী। তার পাশে দেয়াল জুড়ে চেয়ারের সারি। পেছনে চকচকে পার্টিশানের আড়ালে অন্ধকার রান্নাঘর। খাবার ঘরের দুপাশে দুটি শোবার ঘর।

বৃদ্ধা মহিলা ছেলে বৌ-কে চুমু খেয়ে শুতে চলে গেল নিজের ঘরে। রান্নাঘরের চেয়ারে শুয়ে আছে বিড়ালটা। স্বামিস্ত্রীও চলে গেল নিজেদের ঘরে। ঘরের পেছন-দরজা দিয়ে নেমে যাওয়া যায় পাশাজ-এর আঁধার-ঘেরা সংকীর্ণ পথে।

স্বামীর সর্বদাই জ্বরো-জ্বরো ভাব; তক্ষুনি শুয়ে পড়ল। তরুণী জানালা খুলে খিড়কী বন্ধ করতে গেল। পাসাজ-এর কৃষ্ণ, মসী কৃষ্ণ

দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ফিরলো নীরবে। তারপর তাচ্ছিল্য ভরে একান্ত নিরাসক্তিতে নিজেকে এলিয়ে দিল বিছানায়।

দুই

মাদাম রাকুয়া ভারনতে পোশাকের কারবার চালাতেন। একটানা প্রায় পঁচিশ বছর তিনি সেই ছোট্ট একটা দোকানে কাটিয়েছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক বছর পর আর তিনি তেমন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। শ্রান্ত-অবসন্ন হয়ে সে দোকান বিক্রী করে দেন। আগের জমানো টাকা আর দোকান বিক্রীর টাকা মিলে মোট দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। সেই টাকা খাটিয়ে তিনি পাচ্ছিলেন বছরে দু হাজার ফ্রাঁ। তাঁর একার পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। পৃথিবীর চটক আর হট্টগোল এড়িয়ে একা একা থাকতেন তিনি; নিজের জন্যই বিরলে রচনা করেছিলেন সেই শান্তির নীড়।

বছরে চারশ ফ্রাঁ দিয়ে তিনি ভাড়া নেন বাগানে ঘেরা ছোট্ট একটি বাড়ী। বাগানটি গিয়ে মিশেছে সীন নদীর তটরেখায়। দেখতে কনভেন্টের মত। এই নির্জন, নিরালা আবাসে যাবার সরু পথ গিয়েছে উদার উন্মুক্ত মাঠের ভিতর দিয়ে। জানলা খুললেই নজরে পড়ে নদী আর তার ওপারের আঁকাবাঁকা পাহাড়।

পঞ্চাশোত্তর গৃহকর্ত্রী নিজেকে লুকিয়ে রাখেন এখানে। এই ছায়াচ্ছন্ন নিরালায় পুত্র ক্যামিলাস ও ভাগ্নী থেরেসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁর শান্ত সমাহিত জীবন।

ক্যামিলাসের বয়স তখন সবে কুড়ি। মা তখনো ছোট ছেলের মতই তাকে রেখেছিলেন আদরে ডুবিয়ে।

দীর্ঘ শৈশব আর কৈশোর জুড়ে তাঁকে নিয়ে চলে যমে-মানুষে টানাটানি। তাই তাকে চোখের আড়াল করতে পারেন না তিনি। একটা রোগ ছাড়ে তো অন্যটা ধরে তাকে। যত রাজ্যের রোগরাগি—কিছুই বাদ যায়নি তার। লম্বা পনেরো বছর ধরে তিনি আঁকড়ে রেখেছিলেন ছেলেকে—যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে। ধৈর্য, তিতিক্ষা ও সেবায় জয়ী হলেন তিনি অবশেষে।

যমের হাত থেকে ফিরে কিশোর ক্যামিলাস রোগের ধাক্কায় কাহিল হয়ে পড়ল ভীষণ। দেহের বাড় গেল কমে—মাথায় ছোট আর ক্ষীণজীবী হয়ে রইল সে। ক্ষীণ জীবনের ভারে পিষ্ট পুত্রের প্রতি মাতৃস্নেহ ঝরতে লাগল আরও অজস্র ধারায়। পুত্রের রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে বাৎসল্য ভরা দৃষ্টিতে তাকালে মায়ের বুক গর্বে ফুলে ওঠে—কতবার মাতৃস্নেহের মৃত সঞ্জীবনী সুধায় সিঞ্চিত সন্তানকে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি বৈতরণীর পার থেকে!

রোগ-বিরতির দুর্লভ মুহূর্তে কিশোর ক্যামিলাস ভর্তি হয় ভারনঁর বৈষয়িক বিদ্যালয়ে। সেখানেই তার বর্ণ পরিচয় ও অঙ্ক শিক্ষা। ব্যাকরণের ভাসাভাসা জ্ঞান, গুণ ও দীর্ঘ-ভাগ পর্যন্ত গড়ায় তার বিদ্যা। পরে সে হিসাব-নিকাশ শিখেছিল কিছুদিন। কলেজে পাঠানোর কথা কেউ বললে মাদাম রোকুয়াঁর গা উঠত শিউরে; তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল তাঁকে ছেড়ে দূরে কোথাও পাঠালে এ ছেলেকে বাঁচানোর সাধ্য নেই কারুর। লেখাপড়াই ওর কাল—বলতেন তিনি। ক্যামিলাস তাই রইল অজ্ঞানতায় ডুবে; আর রোগের সঙ্গে অজ্ঞতা মিলে তাকে করে তুলল আরও পঙ্গু।

আঠারো বছর বয়সে মাতৃস্নেহের আড়ালে নিরংকুশ অকর্মণ্যতায় যখন জীবনে বিরক্তি জন্মে যাচ্ছিল, তখন সে মাসে ষাট ফ্রাঁ মাইনের কাজ

নিল এক শুকনো জিনিস পত্তরের দোকানে। চঞ্চল প্রকৃতির বলে আলস্য একবারেই তার বরদাস্ত হত না। কঠোর পরিশ্রমের কাজ পেয়ে সে মনে বেশ শান্তি পেল। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বিরাট বিরাট বিল আর ইনভয়েস নিয়ে লম্বা যোগ কষায় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে তার ভালই লাগত। দিনের শেষে ক্লান্ত অবসন্ন মাথায় আর কিছু ঢুকতে চাইত না। স্তব্ধ বিহ্বল সেই মানসিক জড়তায় ছিল তার বিপুল আনন্দ। মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে যেতে হয়েছিল সেই কাজ করতে। তিনি চেয়েছিলেন চিরকাল তাকে আঁচলের নিধি করে রাখতে—জীবন সংগ্রামের পথ সযত্নে পরিহার করে সলতে দিয়ে মুড়ে রাখবেন চিরদিন। এবার তার তারুণ্য করল বিদ্রোহ। সে প্রস্ফুটিত হতে চায়—অন্য পাঁচজনের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় চাল খেলনা—তার প্রকৃতির দাবী হল কাজ। মার স্নেহ, অকাতর সেবা তাকে করে তুলেছিল বিষম আত্মকেন্দ্রিক ; যারাই তাকে করুণা করত তাদেরই ভালবাসতো বলে মনে করত। অথচ জীবন তার বয়ে চলত অন্য খাদে —নিজের ভাল লাগা না লাগার নেশায় সে থাকত বিভোর—শুধু চাইত কি করে পাবে আনন্দ।

মাদাম রাকুঁয়ার আদর যত্নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠায়, তাঁর তাবিচকবচ অরিষ্ট পাচনের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে মহানন্দে ঐ কাজে ঢুকেছিল। তারপর সন্ধ্যেয় বাসায় ফিরেই মামাত বোন থেরেসাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত সীনের ধারে।

থেরেসাও অষ্টাদশীই হবে। আজ থেকে ষোল বছর আগে—মাদাম রাকুঁয়া তখন জাঁকিয়ে ব্যবসা করছেন। একদিন তাঁর ভাই ক্যাপ্টেন দিগাঁ একটি বাচ্চা মেয়েকে কোলে নিয়ে আসেন তাঁর কাছে। আলজেরিয়া থেকে তিনি সবে ফিরেছেন।

"দেখছ ত বাচ্চাটাকে। তুমি হলে এর পিসী।" হাসতে হাসতে

তিনি বললেন। "বেচারার মা মারা গেছে....কি যে করি একে নিয়ে। তোমার কাছেই রাখতে এলাম সেজন্যে।"

মাদাম রাকুরা বাচ্চাকে কোলে করে তার গোলাপী গাল দিলেন চুমোয় ভরে। দেগাঁ ভারনঁতে রইলেন সপ্তাহ খানেক। তাঁর বোন ক্বচিৎকদাচিৎ বাচ্চাটার কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করত। ওরা তে থাকবার সময় কোন্ পরমাসুন্দরীর গর্ভে বাচ্চাটা জন্মেছিল, এটুকু খবর মাত্র সে ভাসাভাসা ভাবে সংগ্রহ করেছিল। চলে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে মাত্র ক্যাপ্টেন বোনের হাতে বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। তাতে তিনি দিয়েছেন বাচ্চাটির পিতৃ পরিচয়। মেয়েটিকেও দেওয়া হয় তাঁরই উপাধি। তারপর তিনি গেলেন চলে। আর কখনো তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি এদের কারুর; কয়েক বছর পর আফ্রিকায় তিনি প্রাণ হারান।

পিসীর আদরে আবদারে ক্যামিলাসের সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে বসে থেরেসা বড় হতে লাগল। লোহার মতন গড়ন ছিল তার, তবু রুগ্ন ভাইটির পাল্লায় পড়ে তাকেও থাকতে হত ওষুধের উপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে খড়ের জ্বালানো আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকত অপলক দৃষ্টিতে। এভাবে সত্ত নিরাময়ের জীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ল সে নিজেরই মধ্যে। গলার স্বর গেল চুপসে—হাঁটাচলা রূপান্তরিত হল নিঃশব্দ সঞ্চারে, নীরবে নিশ্চুপ হয়ে থাকত বসে, নিষ্প্রাণ দুরবগাহ দৃষ্টির ছায়া পড়ত দুটি বিকশিত চোখে। কিন্তু ঈষৎ দেহ সঞ্চারণেই ফুটে উঠত ঋজু পেশীর কমনীয়তা। নজরে পড়ত প্রাণ প্রাচুর্যে উজ্জ্বল, বঞ্চিত বাসনার সুষুপ্ত ভাণ্ডার সেই তনুদেহের পরতে পরতে। একদিন তার ভাইটি মাথা ঘুরে পড়ে গেলে সে তাকে অক্লেশে কোলে তুলে নিয়ে আসে। ঐ পরিশ্রমে চোখ মুখ হয়ে উঠে লাল—গালের আভা হয় রক্তিম। যে

শম্বুক জীবন কাটছিল তার, সেই রোগহীন অপচীয়মান পরিবেশও তাহলে তাকে হতশ্রী, হৃতসামর্থ্য করতে পারেনি! মুখাবয়ব শুধু হয়েছিল ফ্যাকাশে আর অন্ধকারে মনে হত প্রায় কুৎসিতদর্শনা বলে। প্রায়ই সে গিয়ে দাঁড়াত জানালার ধারে। দূরের বাড়ীগুলোর ছাদের উপর দিয়ে দৃষ্টি যেত তার ছড়িয়ে উদার অনন্ত আকাশের মাঝে—সূর্যের সোনালী আলোর যাত্রা পথে।

ব্যবসাপত্র বেচে দিয়ে মাদাম রাকুঁয়া নদীর পাড়ের ছোট বাড়ীতে আশ্রয় নিলে মনে মনে লাফিয়ে ওঠে থেরেসা। "চুপচুপ, গোলমাল করিস না" বলে পিসীর কাছে এত ধমক খেয়েছে সে যে, স্বাভাবিক উৎসাহ—উদ্দীপনা—সবকিছু চেপে রাখত নিজের মধ্যেই। একান্ত আত্মস্থ ছিল সে, বাইরের প্রশান্তির নীচে ঢাকা থাকত প্রচণ্ড রাগ, মনে হত আজীবন কাটিয়েছে সে ঐ রুগ্ন ভাইটির ঘরে—মৃত্যুপথ যাত্রী বালকের সাহচর্যে। ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অকাল বার্ধক্য বুড়োবুড়ীর মত নিঃসাড় চলন, মৌন, শান্তভাব—আর থেমে থেমে কথাবলার চেষ্টা। নদীর রূপালী রেখার সবুজের মেলার দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া একবার নজরে পড়তেই তার মনে হয়েছিল হুটোপাটি দৌড়ঝাঁপ করে। পাঁজরের মধ্যে দ্রুত লয়ে বইতে থাকে হৃদপিণ্ড অথচ পেশীর পরিবর্তন ঘটে না এতটুকু; একটু স্তিমিত হাসির রেখা খেলে যায় তার মুখে যখন পিসী জিজ্ঞেস করলেন নতুন বাড়ী ভাল লাগল কিনা।

তারপর জীবন চলল তার ভালোর পথে বেয়ে। বাইরে সে তেমনি নম্র, প্রশান্ত ও নিরাসক্ত, রুগ্ন বালকের পাশে মানুষ হওয়া মেয়ে থাকলেও ভেতরে ভেতরে পুড়ে মরত' বাসনার যাতনায়। একা থাকলেই সে গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ত নদীর পাড়ের সবুজ ঘাসের ওপর। পশুর মত শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা হয়ে উঠত খাড়া। গহন কালো চোখে

পড়ত দিগন্তের ছায়া। ঠিক ঐ ভাবে রোদে পুড়ে শূন্যমনে কাটিয়ে দিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা; শুধু নখের আঁচড়ে কাটিত মাটি। চঞ্চল স্বপন পাগল করে তুলত তাকে। নদীর দিকে তাকিয়ে ভাবত ঐ উচ্ছল জলরাশি তাকে গ্রাস করতে আসছে এগিয়ে; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে বয়ে যেত শিহরণ—সেই উত্তাল তরঙ্গের হাত থেকে আত্মরক্ষায় সুতীব্র প্রচেষ্টায় আকুল হয়ে উঠত সে।

সন্ধ্যায় অন্তর্জ্বালা নিভে আসবার পর থেরেসা পিসীর পাশে বসে সেলাই করত। বাতির মৃদু আলোয় তার মুখ ছবি দেখায় নিষ্প্রাণ। ইজি চেয়ারে বসে হিসাব কষে। মাঝে মাঝে ঝিমুন্ত ঘরের নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে দু-একটি চাপা কথাবার্তার রেশ।

মহিমময়ী করুণায় মাদাম রাকুঁয়া—তাকালেন সন্তানদের প্রতি। জানেন বিয়ে দিয়ে দেবেন তাদের। তখনো তিনি ছেলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন সে জীবন-মরণ অসুখে ভুগছে আর তিনি নিজেও যে মরতে পারেন—একথা মনে হতেই সারা গা শিউরে উঠল। তখন ত ছেলে থাকবে অসুস্থ নিঃসঙ্গ একা। তখন তিনি থেরেসার উপর ভরসা করতে পারেন; নিজের মনকেই প্রবোধ দিলেন, মেয়েটি নজর রাখতে পারবে ক্যামিলাসের উপর, ভাগ্নীর শান্ত সমাহিত গতি, নিঃসঙ্গ সেবার মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন আশ্রয়। মাদাম রাকুঁয়া তাকে কাজ করতে দেখেছেন—তারই হাতে তুলে দিতে চাইলেন ছেলের ভবিষ্যৎ। ভালমন্দ সব কিছুর দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে হবেন নিশ্চিন্ত! এদের বিয়ে হবে, না এ বিয়ে দিতেই হবে তাঁকে!

সন্তানদের উভয়েই জানত একদিন তাদের বিয়ে হবে। এই ধারণা নিয়েই বেড়ে উঠেছে তারা—কাজেই বিয়ের কথা খুবই স্বাভাবিক মনে হল তাদের কাছে। বাড়িতে তাদের মিলনের কথা হত ভবিতব্য বলে। মাদাম রাকুঁয়া বলতেন, "থেরেসার একুশ বছর না হওয়া পর্যন্ত

দেখব।" সে দেরী তারা করলে—অচঞ্চল অধ্যবসায়ে ও অসংকোচে!

রোগজীর্ণ ক্যামিলাসের মনে শৈশবের কামনার বহ্নি জ্বলেনি এতটুকু। বোনের কাছে ছোট ছেলেটির মতই ছিল সে। তাকে চুমু খাবার মধ্যে থাকত না সামান্যতম আবেগের আগুন। আত্মকেন্দ্রিক প্রশান্তির ব্যত্যয় ঘটত না কোন। তার চোখে থেরেসা ছিল খেলার সাথী, গল্পে-গুজবে তার জীবনের নিঃসাড় মুহূর্তগুলি কাটিয়ে দেবার দায়িত্ব তার; আর মাঝে মাঝে সে দেবে তাকে পাচন সিদ্ধ করে। খেলতে খেলতে কখনো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেও তার ভাবান্তর ঘটেনি—মনে হয়েছে কোন ছেলেকেই আলিঙ্গন করছে সে। দেহের শিরায় ডাকত না কামনার বন্যা। তার পরুষ আলিঙ্গনের বন্ধনে জর্জরিত, চঞ্চল ঊর্ধ্বমুখীন থেরেসার স্ফূর্ত, উত্তপ্ত অধর নিষ্ঠুর চুম্বনের পেষণে স্তব্ধ করে দেবার কথা মনে জাগেনি তার।

মেয়েটিও হয়ে গিয়েছিল কেমন জবুথবু, নিষ্প্রাণ। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেও কখনো কখনো চেয়ে থাকত ক্যামিলাসের দিকে—মুহূর্তের পর মুহূর্ত যেত কেটে—তারও হত না কোন ভাবান্তর। নিজের অজান্তে শুধু অনুভব করত অধরোষ্ঠে তীব্র জ্বালা—প্রসুপ্ত কামনার দাবদাহ। নির্মম ইচ্ছাশক্তির তাড়নায় দমিত কামনাবাসনার সামান্যতম প্রকাশও পেত না তার চোখে মুখে। তেমনি নিস্পৃহ—তেমনি মনোযোগী থাকত সে। বিয়ের কথা শুনে সে গম্ভীর হল মাত্র—মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল মাদাম র‍্যাকুয়ার প্রস্তাবে। ক্যামিলাস চলে গেল শুতে।

গ্রীষ্মের সান্ধ্যোয় তরুণতরুণী দু'জন ছুটে যেত নদীর পারে। মার সযত্ন-সেবায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠত ক্যামিলাস। তার ইচ্ছে হত বিদ্রোহ করে নেচেকুঁদে কঠিন রোগ বাধিয়ে ফেলে—যেমন করেই হক মা'র আদরের হাত থেকে মুক্তি চায় সে। তখন সে থেরেসাকে ডেকে নিত সঙ্গে। তার সঙ্গে হুটোপাটি জড়াজড়ি করত সবুজ ঘাসের মধ্যে।

একদিন তার ধাক্কা খেয়ে থেরেসা মাটিতে পড়ে যায়। অপমানে রাগে গর গর করতে করতে বন্য জানোয়ারের মত সে উঠে পড়ল চোখের নিমিষে—মুখ রাগে লাল—চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে তার। দু'হাত তুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল—ক্যামিলাসের ওপর। ক্যামিলাস সে ভার সহ্য করতে পারল না। মাটিতে পড়ে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল সে।

এই ভাবে কত মাস গেল—বছরের পর বছরও গেল কেটে। দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এল তাদের। মাদাম রাকুঁয়া থেরেসাকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার বাবা-মার সব কথা বললেন তাকে—জন্মের কাহিনীও শোনালেন সব। মেয়েটি চুপ করে সব কথা শুনে—কোনও উত্তর না দিয়ে চুমু খেল শুধু তাকে !

সে-রাতে থেরেসা সিঁড়ির বাঁ পাশের নিজের ঘরে না গিয়ে, শুতে এল ডানদিকের ভাইটীর ঘরে। তার দৈনিক জীবন-যাত্রার এটুকুই ঘটল পরিবর্তন। পরের দিন সকালে তরুণ-তরুণী নীচে নামবার সময়ও ক্যামিলাসের অস্বাস্থ্যকর চঞ্চলতা—কুৎসিত আত্মকেন্দ্রিকতার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি—আর থেরেসার মুখেও ছিল ঠিক সেই মৃদু তাচ্ছিল্যের ভাব, গুরু গম্ভীর মুখের ভাবে যেন বুক দুরু দুরু করে।

তিন

বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই ক্যামিলাস মাকে বলল ভারঁন ছেড়ে পারীতে গিয়ে থাকবে। মাদাম রাকুঁয়া প্রতিবাদ করলেন; নিজের জীবনে স্থিতাবস্থায় পৌঁছে আর তিনি কোনও রকম অদল বদল করতে চান না। ছেলে রেগে-মেগে আগুন হয়ে জানিয়ে দিল তার মতে মত না দিলে এমন রোগে পড়বে যে তখন মজা বুঝবে সবাই।

"তোমার কোন কথার অবাধ্য হইনি কোন দিন", সে বলল মাকে। "বিয়ে করেছি মামাত বোনকে, যখন যে-ওষুধ খেতে দিয়েছ নির্বিবাদে খেয়েছি; আমারও ত নিজের মতে চলার অধিকার আছে; তোমার উচিত কোন উচ্চবাচ্য না করে তাতে সায় দেওয়া........এই মাসের শেষেই চল যাওয়া যাক।"

সে-রাতে মাদাম র‍্যাকুঁয়ার দুচোখ এক হল না। ছেলের জবরদস্তিতে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিল তাঁর জীবনে। আবার নতুন ছাঁদে গড়তে হবে জীবন। ভাবলেন ওদের ছেলে পুলে হলে তখন ত আর এই সামান্য পুঁজিতে চালানো যাবে না। আরও টাকা চাই; আবার তাঁকে ব্যবসায় ঢুকতে হবে, থেরেসাকেও ঢুকিয়ে দিতে হবে কোন একটা কাজে। সকাল হতে না হতেই তিনি খাপ খাইয়ে নিলেন ভারনঁ ছাড়ার সম্ভাবনার সঙ্গে। নতুন জীবনের ছক কাটা তাঁর শেষ।

দুপুরে খাবার সময় আবার তিনি আনন্দে ভরপুর। ছেলে বৌকে ডেকে বললেন, "কি কি করতে হবে শোন। পারীতে যাব। সাজপোষাকের ছোট্ট দোকানের খোঁজ করব সেখানে। আর আমরা— থেরেসা আর আমি ছুঁচ-সুতো বিক্রী করব। আমাদের তাতেই যথেষ্ট। ক্যামিলাস-এর যা ইচ্ছে করে যেন—ইচ্ছে হয় কোন চাকরী বাকরী করুক, না হয় ঘুরে বেরাবে সারাদিন টোটো করে।"

"না, একটা কোন চাকরী খুঁজে নেব," উত্তর দিল সে।

বোকার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে সে ভারনঁ ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল। কোন বড় কোম্পানীতে চাকরী করবে,—এই ছিল মনের ইচ্ছা। বিরাট অফিসে বসে ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ে, কানে কলম গুঁজে—গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে হিসাব করছে—একথা ভাবতেই মুখচোখ উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে তার।

থেরেসার কোন মতামতই জিজ্ঞেস করা হয়নি। চিরকাল সে এমন

নির্বিবাদী যে তার পিসী কি স্বামী কারুরই মনে হয়নি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা। তারা যেখানে যায় সেও যায় তাদের সঙ্গে! তারা যা করে সেও করে তাই; মুখে রা কাড়ে না এতটুকু; দেখে মনে হয় না যে সে যা কিছু করছে বা তার পেছনে কোন সচেতনতার আভাস মাত্র আছে।

মাদাম রাকুঁয়া পারীতে এসে সোজা উঠলেন পাসাজ দু প্যঁ মুতে। ভারনঁার একজন অবিবাহিতা বৃদ্ধার আত্মীয়ের পরিধেয়-বস্ত্রের দোকান ছিল পাসাজ-এ। তিনি সেটা বিক্রী করে দিতে চান বলে মাদাম কিনতে গেলেন সে দোকান। দোকানটিকে বড় অন্ধকার আর ছোট বলে মনে হয় তাঁর। তবে পারীর হৈ চৈ হট্টগোলে তাঁর ভয় ধরল মনে, বিলাস-প্রসাধন সামগ্রীর বাহারে-বিজ্ঞাপনে তাঁর চোখ গেল ধেধে। সে তুলনায় পাসাজ-এর প্রশান্ত প্রদোষছায়া জাগিয়ে তুলল পুরানো দোকানের স্মৃতি। ওখানে তাঁর মনে হল তিনি সত্যি সত্যি কোন গ্রাম্য-পরিবেশেই আছেন। নিশ্চিন্তে দম নিলেন তিনি। ভাবলেন ছেলে-বৌদেরও বোধ হয় ভাল লাগবে ঐ পরিবেশ। তাছাড়া সস্তা দামে পাওয়ায় তিনি মনস্থির করে ফেললেন। মাত্র দু'হাজার ফ্রাঁ দাম দিতে হবে তাঁর। দোকানঘর ও উপরে থাকার জায়গার ভাড়াও বছরে মাত্র বারশ' ফ্রাঁ। মাদাম রাকুঁয়ার হাতে তখন ছিল চার হাজার ফ্রাঁ। তিনি ভেবে দেখলেন লগ্নীর টাকায় হাত না দিয়েও তিনি এক বছরের ভাড়া দিয়েও ব্যবসা চালাতে পারবেন। ছেলের মাইনে আর দোকানের আয় থেকেই তাঁদের সংসার চলবে; তাহলে তাঁর আয়ে হাত দিতে হবে না। সে টাকা দিয়ে তিনি মুনাফা বাড়িয়ে চলতে পারবেন। নাতী-নাতনীদের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ও করতে পারবেন তা থেকে।

উৎসাহভরে তিনি ফিরে এলেন ভারনঁতে। পারীর বুকেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন কুবেরের ভাণ্ডার, সুখের নীড়। ক'দিনের ভেতরেই তাঁর

কথায় পাসাজ-এর সেই সংকীর্ণ, আঁধার দোকান রূপান্তরিত হল—বিরাট প্রাসাদে ; মানসচোখেও দেখতে লাগলেন প্রশস্ত প্রশান্তিভরা 'সুখের নীড়'—হাজারো সুবিধা সেখানে থাকার।

"সত্যি থেরেসা, সেখানে গেলে যে কি ভালই লাগবে তোমার। ওপর তলায় তিন তিনটে চমৎকার ঘর,……পাসাজ-এ লোকের ভীড় লেগেই আছে….দোকানের জানালাগুলো সাজাতে হবে কিন্তু চমৎকার করে….একটু বিরক্ত লাগবে না কারুরও।"

কথার আর বিরাম নেই তাঁর। ব্যবসায়ের পুরানো ফিকির, অন্ধি-সন্ধি সবই মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল আবার। ছোট্ট ব্যবসায়ের কেনা-বেচা দোকান চালানোর কায়দা শেখাতে লাগলেন থেরেসাকে। অবশেষে সীনের ধারের বাড়ী ছেড়ে সমস্ত পরিবারটি চলে এলেন পাসাজ-দু পঁ ন্যুতে।

যে-দোকানে এখন থেকে কাটবে তার জীবনের অবশিষ্টাংশ সেই দোকানে ঢোকবার সময় থেরেসার মনে হল যেন সে পংকিল ড্রেনের ভেতরে ঢুকছে। বমি উঠে আসছিল গলা দিয়ে—অজানা আতংকে উঠছিল শিউরে শিউরে। নোংরা স্যাঁৎসেতে পাসাজ-এর দিকে তাকাল একবার—তারপর দোকান ঘরটিতে ঘুরল-ফিরল কিছুক্ষণ; সেখান থেকে উঠে এল উপরে—ঘরগুলো দেখলো বেরিয়ে। আসবাববিহীন খালি ঘরগুলির জরাজীর্ণতা ও ভয়াল নিঃশব্দতায় আচ্ছন্ন করছিল তাকে ; তরুণীর সমস্ত দেহমন বিহ্বল হয়ে পড়ল—অঙ্গসঞ্চালনার সামর্থ্য রইল না—বাকরোধ হয়ে এল। মেরুদণ্ড বয়ে নেমে আসছে যেন কনকনে হিমেল স্রোত! স্বামী আর পিসী নীচে নেমে গেলে সে এলিয়ে পড়ল ট্রাঙ্কের উপর। হাত পা জমে গেছে তার—বুকফাটা কান্নায় গলা গেছে আটকে। অথচ কাঁদতে ত সে পারছে না।

কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ে মাদাম রাকুঁয়াও বিচলিত হয়ে

পড়লেন। নানাভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছিলেন। যে-কোন অসুবিধা আর মুস্কিলেরই আসান বার করছিলেন তিনি। আলো-আঁধারিকে কাটাচ্ছিলেন মেঘলা দিনের কাণ্ড বলে; আর সবাইকেই বুঝিয়ে দিলেন ভালভাবে ঝাঁট পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্যামিলাস চেঁচিয়ে উঠল, "বাঃ বেশ সুন্দর হয়েছে। তাছাড়া আমরা ত সন্ধ্যেবেলা ছাড়া কেউ উপরে উঠে আসছি না....আমি পাঁচটা ছটার আগে ফিরছিই না....তোমরা দু'জনে থাকবে একসঙ্গে। খারাপ লাগার কথা ত নাই তাতে।"

তরুণটির চোখে আফিসের চটক না ভাসতে থাকলে সে মুহূর্তের জন্যও এই গর্তে থাকতে রাজী হত না। মনে মনে ঠিক ভরসা ছিল—সারাটা দিন আফিসের গরমে কাটবে ভাল আর রাত্তিরে একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেই হল।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দোকান আর থাকার ঘর রইল আগোছাল হয়ে পড়ে। প্রথম দিনই থেরেসা এসে কাউণ্টারের পিছনে বসেছিল। সেখানে বসেই কাটে তার সারাটা দিন। তার সেই নিশ্চল মূর্তি দেখে মাদাম রাকুঁয়া ত অবাক। কোথায় নতুন সংসারে এসে ছেলেমানুষ বৌ ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলবে; ফুলদানী দিয়ে জানালাগুলো দেবে সাজিয়ে; নতুন নতুন দেয়াল মোড়ার কাগজ, পর্দা, কার্পেটের জন্য তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে ফেলবে না তার এমনি জবুথবু ভাব! তিনি একটু মেরামত কি সাজানো কথা তুললেই সে উত্তর দিল: "কেন, কি হবে, আমরা ত বেশ আরামেই আছি—অত বড়-লোকির কি দরকার?"

মাদাম রাকুঁয়ার নিজহাতে সব ঝাড়ামোছা করে গুছিয়ে দিতে হয় শেষে। তার খাটুনী দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে থেরেসা একজন ঝি ডেকে শেষে সব সাফ করে নেয়।

পুরো একটি মাস ক্যামিলাসের কোন কাজ জোটেনি। দোকানে যত কম থেকে পারে বাকী সময় সবটাই সে কাটিয়ে দিচ্ছিল রাস্তায়। ক্রমেই সে এত তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠল যে, এক একবার ভারনঁতে ফিরে যাবার কথাও ওঠাচ্ছিল। অবশেষে তার একটা চাকুরী মিলল অরলঁ্যা রেলকোম্পানীর হেড অফিসে। মাসে একশ ফ্রাঁ মাইনে। তার স্বপ্ন এতদিনে সফল হল।

সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়ত বাড়ী থেকে। রু গুয়েনেগ দিয়ে জেটির দিকে চলতে সুরু করত। পকেটে হাত দিয়ে ইনষ্টিটিউট বাড়ী থেকে বোট্যানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত ঠুক্‌ঠুক্ করে এগোত। দিনে দুবার করে এত দূর এসেও তার কিন্তু খারাপ লাগত না। চলমান জল-স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে যেমন ভাল লাগত তেমনি স্রোতে ভেসে-আসা কাঠের ভেলাও তার দৃষ্টি করত আকর্ষণ। নৎর দামের সামনে প্রায়ই থমকে দাঁড়াত সে। গীর্জা মেরামতের জন্য বাঁধান মাচার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে তার ক্লান্তি আসত না। একটু এগিয়ে গিয়ে গুণতে শুরু করত স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসা গাড়ীর স্রোত। সন্ধ্যেয় সে অবসন্ন ভাবে আফিসের কারোও উদ্ভট গল্প মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে ফিরতো—হাতে সময় থাকলে বোট্যানিক্যাল গার্ডেন পেরিয়ে ভাল্লুকগুলোর মজা দেখতো। আধঘণ্টা খানেক সে কাটাত সেখানে। ঐ অতিকায় জন্তু জানোয়ারের প্রত্যেকটি কাজ সে লক্ষ্য করত হাঁ করে। তারপর মনে হত বাড়ী ফেরার কথা। ধীর পদক্ষেপে পথচারীর ভিড় পেরিয়ে এসে পৌঁছত নিজের বাড়ী।

বাড়ী ফিরেই খেয়ে নিত। খেয়ে নিয়ে শুরু করত পড়তে। বার্কোর বই নিয়ে রোজ নিয়ম করে বিশ-ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়তই তা থেকে। খারাপ লাগলেও থামত না। থিয়ের-এর লেখা কনসালেট ও সাম্রাজ্যের ইতিহাস দশ সেন্টিন দামের এক একটি খণ্ড। লা মার্টিনের গিরোদাঁ্যা'র

ইতিহাস কিংবা অন্য কোন বিজ্ঞানের বই নিয়ে বসত পড়তে। ধারণা ছিল এভাবে সে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলছে। কখনো কখনো স্ত্রীকেও শোনাত এখান-ওখান থেকে পড়ে। থেরেসা কি করে একা-একা মুখ গুমরে সারা সন্ধ্যে বই-টই কিছু না পড়ে যে কাটায় সে ভেবে পেত না। মনে মনে স্ত্রীকে ভাবত নিতান্তই সাধারণ মেয়ে বলে।

বই-এর বালাই ছিল না থেরেসার। তার চেয়ে উদাসীনের মত আলস্যজড়িমায় সময় কাটাতে ভাল লাগত তার ঢের বেশী। তবে সব সময়েই তার মেজাজ থাকত ঠাণ্ডা—কারুর সঙ্গেই খচাখচি বাধত না তেমন। একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজে উদ্যোগী না হয়ে নির্লিপ্তভাবে কি করে অন্যের মন যুগিয়ে চলতে পারে তার দিকে।

ব্যবসাও চলতে লাগল ঢিমে তালে। প্রত্যেক মাসেই লাভের অঙ্ক রইল সমান। স্থানীয় দর্জী-বউরাই ছিল তাদের খদ্দের। প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর এক একটি মেয়ে এসে কয়েক স্যু'র জিনিস কিনে নিয়ে যেত। ঠোঁঠে যান্ত্রিক, প্রাণহীন হাসির রেশ টেনে থেরেসাও তাদের একই ভাষায় অভ্যর্থনা করত। সত্যি কথা বলতে কি খদ্দের ধরে রাখার জন্যে সব দায়ই যেন ছিল মাদাম রাকুঁয়ার। তিনিই বলতেন তাদের সঙ্গে কথা; অনর্গল গল্পে তিনি ছিলেন পটু।

তিনটি বৈচিত্র্যহীন বছর কেটে গেল এমনি একের পর এক। তার মধ্যে এক দিনের জন্যও ক্যামিলাস অফিস কামাই করেনি; স্ত্রী ও মাও দোকান ছেড়ে যাননি কোথাও। থেরেসার জীবন কাটে সেই স্যাঁৎসেতে ভ্যাপসা পরিবেশের নিস্তব্ধ মালিন্যে; সম্মুখে অনাস্বাদিত উচ্ছল জীবনস্রোত—সব শূন্য—মহাশূন্যে ঘেরা। রাতে হিম শীতল শয্যায় তার আশ্রয়—প্রাতে সেই অর্থহীন নিরানন্দ দিনের মহড়া।

চার

সপ্তাহে একদিন করে বৃহস্পতিবার রাকুঁয়াদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের আসর বসত। খাবার ঘরে জ্বলত বড় আলোটা আর উনুনে চড়ানো থাকত চায়ের জলের কেৎলী। আসর হত বেশ জমাটি। বিষ্যুৎবারের সঙ্গে ছিল সপ্তাহের অন্যদিনগুলির তুলনায় এক বিরাট ব্যতিক্রম—পারিবারিক জীবনের মান বাঁচিয়ে নেশা-মাতলামি ঢলাঢলির দিন। রাত এগারটায় তাতে পড়ত ছেদ—যখন সবাই যেত শুতে।

পারীতে মাদাম রাকুঁয়ার এক পুরানো বন্ধু বেরিয়ে পড়ে—পুলিশ সাহেব মিশ'। তিনি ভারনঁতে থাকার সময় কুড়ি বছর ছিলেন মাদাম রাকুঁয়ার সঙ্গে একই বাড়ীতে। তাদের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা জন্মে যায়; তারপর মাদাম দোকানপাট বিক্রী করে নদীর ধারে বসবাস আরম্ভ করলে ধীরে ধীরে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ে। মিশ'ও গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে পরে পারীতে চলে আসেন। সেখানে এসে মাসিক পনের শ ফ্রাঁ পেন্সনের ওপর নির্ভর করে রু দী লা সীন-এ আস্তনা গাড়েন। ঝিরঝিরে বাদলা দিনে পুরানো বন্ধু মাদাম রাকুঁয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর পাসাজ-দু পঁ ন্যতে; সেই রাতেই তিনি নিমন্ত্রণ খেতে আসেন ওদের বাড়ী।

এই ভাবে শুরু হয় বিষ্যুৎবারের নিমন্ত্রণের আসর। প্রাক্তন পুলিশ সাহেবের অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেল সপ্তাহে একদিন করে ও বাড়ীতে আসা। পরে তিনি নিজের ছেলে অলিভারকেও সঙ্গে নিতে সুরু করেন। বছর তিরিশেক বয়স হবে তার; লম্বা লিকলিকে চেহারা। বিয়ে হয়েছে তেমনি এক বেঁটে, রোগা মেয়ের সঙ্গে—চলতে ফিরতেই তার ন মাস। অলিভার পুলিশ আফিসে ভাল কাজ করে; মাইনে পায় মাস গেলে

তিন হাজার ফ্রাঁ। ক্যামিলাসের চোখ কড় কড় করে তা দেখে। গোয়েন্দা অফিসের বড়বাবু হলেন তিনি। গোড়া থেকেই থেরেসার এই কড়া মেজাজী অহংকারী যুবকটিকে ভাল লাগেনি। নিজের ত ঐ ছিরির চেহারা তার উপর সঙ্গে বে-মানান রোগ পাণ্ডুর স্ত্রীকে নিয়ে এমন ভাবে দোকানে ঢোকে যেন ধন্য করে দিল সবাইকে।

ক্যামিল্লাস আনত আর একজন অতিথি। রেল অফিসে চাকরী করেন তিনি। কুড়ি বছর হল গ্রীভের রেলে চাকরী; তিনিও সেখানের বড়বাবু—মাইনে একুশ শ ফ্রাঁ। তিনি ক্যামিলাসকে কাজ জুগিয়ে দেন, ক্যামিলাসও তাই তাঁকে একটু সমীহ করেই চলে। দিবাস্বপ্নে কতবার যে ক্যামিলাস দেখেছে একদিন তাঁর মৃত্যু হলে ঐ জায়গায় সে তাঁর চেয়ার দখল করে বসবে! মাদাম রাকুঁয়ার আদর আপ্যায়নে গ্রীভে ভারী খুশি। তিনিও সেই থেকে নিয়ম মাফিক সপ্তাহে সপ্তাহে আসতে আরম্ভ করেন। দু'মাস পরে পাসাজ দু পঁ ন্যুতে আসা-যাওয়া তাঁর অফিস যাওয়ার মতই ঘড়িবাঁধা কাজে দাঁড়িয়ে গেল। নিজের অজান্তে আপনা থেকেই চলে আসতেন সে-বাড়ী।

তখন থেকে আসরও হয়ে ওঠে হাস্যমুখর। কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় মাদাম রাকুঁয়া উনুন জ্বেলে, টেবিলের ঠিক মাঝখানে বড় বাতিটা বসিয়ে দেন। তার পাশে পাশা খেলার সাজসরঞ্জাম রেখে চায়ের আসবাব রাখেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে। ঠিক আটটার সময় মিশ' ও গ্রীভের দেখা হয় দোকানের সামনে। একজন আসেন রু মাজারিন দিয়ে, অন্যজন রু দি লা সীন ধরে। তাঁরাও ঢোকেন আর সবাই উপরে চলে আসেন। সেখানে যে-যার আসন দখল করে নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন অলিভার, আর তার স্ত্রীর জন্যে। ওদের আসতে দেরী হবেই হবে। সবাই এলে মাদাম রাকুঁয়া চা ঢেলে দিতে শুরু করেন, ক্যামিলাস পাশার ছক বার করে। দেখতে দেখতে সম্বিৎহারা

হয়ে খেলায় মগ্ন হয়ে পড়েন সকলে। শুধু পাশার দানের ঠকাঠক্ আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু আর তখন কানে বাজে না। প্রত্যেক দানের শেষে দু তিন মিনিট চলে কথা কাটাকাটি—তারপর আবার যে-কে সেই। সবাই চুপচাপ—শুধু দানের আওয়াজ।

কিন্তু থেরেসা এমন নির্লিপ্ত ভাবে খেলে যে ক্যামিলাসের বিরক্তি ধরে মনে। এক হাতে ভারন থেকে আনা মাদাম রাকুঁয়ার পেয়ারের বেড়ালকে কোলে টেনে অন্যহাতে সে দান ছাড়ে পাশার। বিষ্যুৎবারের সন্ধ্যেটা তার কাছে যেন বালাই বিশেষ। প্রায়ই অনুযোগ করত ভাল লাগে না বলে, নয়ত মাথা ধরার নাম করে চোখ বুজে চুপচাপ ঝিমোত সেই আসরে। টেবিলের উপর কনুই-এর ভর রেখে গালে হাত দিয়ে সে এক মনে লক্ষ্য করত পিসী আর স্বামীর অতিথিদের। প্রত্যেকটি মুখের দিকে তাকাতেই জ্বলে উঠত সে মনে মনে। ঘৃণা ও অবদমিত বিরক্তিতে একজনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনত অন্যের দিকে। বুড়ো মিশ'র সাদা মুখ জুড়ে লাল লাল ব্রণের দাগ; দ্বিতীয় শৈশবের বার্ধক্যে নুয়ে পড়া নিষ্প্রাণ মুখ; গ্রীভের ছুঁচলো মুখ, বুৎকুতে গোলগোল চোখ আর বোকা বোকা সরু ঠোঁট; অলিভারের চোয়ালের হাড় দুটো যেন চামড়া ফুটে বেরিয়ে পড়বে, তার বেয়ারা শরীরে শূন্যগর্ভ মুখমণ্ডল আর অহংকারী চলনের ঠাট্; অলিভিয়ার-এর স্ত্রী সুজানের মুখখানা মিষ্টি হলে কি হয় বড় রোগ-জীর্ণ, পাণ্ডুর—চোখে অর্থহীন দৃষ্টি, বিবর্ণ ঠোঁটে রক্তের লেশ মাত্র নেই। যাদের নিয়ে তার সারাটা সন্ধ্যে কাটছে তাদের একজনকেও রক্তেমাংসে গড়া মানুষ বলে মনে হয় না থেরেসার। কখনো কখনো বসে থাকতে থাকতেই সে মরীচিকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ত। মনে হত কে যেন তাকে কবর দিয়েছে; আশে পাশে চারিদিকেই মৃতদেহ ছড়ানো। পুতুল নাচের পুতলের মত সেই সব মড়াগুলোও হাত-পা-নাড়ছে। খাবার ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় তার দম আটকে আসে। শ্মশানের নিস্তব্ধতা, বাতির পীতাভ

নিস্তেজ আলোয় তার শিরা উপশিরা বয়ে ভয়ের কনকনে হিমেল পরশ আসে নেমে—মনে গুমরে মরে কত অব্যক্ত ব্যথা-বেদনার মূর্চ্ছনা।

দোকানের দরজায় টাঙানো ঘণ্টার আওয়াজ জানিয়ে দেয় কোন খরিদ্দারের শুভাগমন। থেরেসা কান পেতে শোনে। ঘণ্টা বাজতে না বাজতে ছুটে নেমে আসে নীচে। খাবার ঘরের আবহাওয়ার হাত থেকে যতটুকু নিষ্কৃতি মেলে আর কি! ঢিমেতালে খরিদ্দারের হুকুম তামিল করে। খরিদ্দার চলে গেলে একা একা সে কাউণ্টারের পেছনে বসে থাকে আনমনে; উপরে উঠতে ভয় করে। গ্রীভে আর অলিভার-এর মুখ ত দেখতে হবে না কিছুক্ষণ; তাতেই তার আনন্দ। দোকানের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেহের জ্বালা কমে আসে তার—সে ডুবে যায় চিন্তার গভীরে।

তা'বলে কতক্ষণ আর নীচে দেরী করা যায়? তার অদর্শনে মেজাজ খিঁচড়ে উঠে ক্যামিলাসের। কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না কি করে বিষ্যুৎবারের সন্ধ্যেয় কেউ ঘরে না থেকে দোকানে কাটাতে পারে। দোতালার ঘোরানো সিঁড়িতে ভর দিয়ে খুঁজতে লাগে স্ত্রীকে।

"এই"—সে চেঁচিয়ে উঠে "ওখানে কি করছ? উপরে আসছ না কেন? এদিকে গ্রীভের যে পোয়া বারো, লাভের বরাৎ, আবার জিতেছে।''

ধীরে সুস্থে উপরে উঠে তরুণী আবার তার জায়গায় গিয়ে বসে, মিশ'র মুখোমুখী। কি বিশ্রী দেখায় তার ঝুলেপড়া ঠোঁট দুটো—গা বমি বমি করে হাসি দেখলে। তখন থেকে কোনও রকমে দম আটকে বেড়াল কোলে করে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাটিয়ে দেয় সেই আসরে। যাতে জীবন্ত পুতুল গুলোর দিকে একবারও তাকাতে না হয় সেজন্যে সারাক্ষণ নজর রাখে কোলের বেড়ালের উপরেই।

পাঁচ

এক বিষ্যুৎবারে অফিস ফেরতা ক্যামিলাস একজন লম্বা-চওড়া গাঁট্টাগোট্টা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে ঢুকল। তাকে দেখিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি এই ভদ্রলোককে চিনতে পারলে না?"

বৃদ্ধা মহিলা বহু চেষ্টা করে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়িয়েও কিছু উদ্ধার করতে পারলেন না। থেরেসা ত নিছক দর্শক মাত্র।

"সে কি?" ক্যামিলাস বলে উঠল—"তোমার সেই ছোট্ট লরঁাকে মনে নেই? জুফোস-এর দিকে যেতে যে-গমের ক্ষেত পড়ে তার মালিক বুড়ো লরঁার ছেলে? দু'জনে স্কুলে যেতাম এক সঙ্গে....আমাদের পাশেই ওর খুড়োর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ও আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকত। তুমি ওকে কত রুটি আর জ্যাম দিতে।"

মাদাম রাকুঁয়ার এতক্ষণে মনে পড়ল ছোট্ট লরঁার কথা। মনে হল বড্ড বুড়িয়ে গেছে যেন সে; এর মধ্যেই কত লম্বা হয়েছে! প্রায় কুড়ি বছর ত হবেই তিনি শেষ দেখেছেন ওকে। প্রথমে চিনতে—না-পারার ত্রুটি দূর করতে চাইলেন প্রচুর আদর আপ্যায়নে। লরঁাও বেশ সহজ ভাবে খাপ খাইয়ে নিল সকলের সঙ্গে। একপাশে বসে পড়ে পরিষ্কার গলায় সকলের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল।

"ভাবতে পারো", ক্যামিলাস শুরু করল—"এই বুড়ো দামড়া অরল্যা রেলকোম্পানীতে এক বছরের উপর কাজ করছে—আর আমাদের দেখা হল মাত্র আজ বিকেলে। কি বিরাট যে অফিস আমাদের!"

কথা কটি বলতে বলতে ক্যামিলাসের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—অধরোষ্ঠ হল কুঞ্চিত—ঐ বিরাট অফিসে কাজ করার অহমিকায় ফেটে পড়তে লাগল সে। তারপরে, মাথা নেড়ে আবার শুরু করল:

"ওর কিন্তু স্বাস্থ্য খুব ভাল; পড়াশুনাও যথেষ্ট করেছে—পাচ্ছেও এখন পনেরশ ফ্রাঁ। বাবা ওকে কলেজে পাঠান। সেখানে আইন পড়ে ও ছবি আঁকাও শেখে। সত্যি, না লরাঁ? তোমায় কিন্তু ছাড়বো না আজ আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে তবে বাড়ী যেতে পাবে।"

"বেশত" বলে টুপিটা নামিয়ে দোকানে বেশ যুৎ করে বসল এবার সে।

মাদাম রাকুঁয়া মেতে উঠলেন হাঁড়িকুড়ি নিয়ে। থেরেসা এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি। এবার সে দেখে নিল নবাগতকে এক লহমা। সত্যিকার মানুষ এতদিন তার নজরে পড়েনি। তাই লম্বা-চওড়া নওজোয়ান লরাঁকে দেখে সে চমকে উঠল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল—তার ঘনকালো চুলে ঘেরা ছোট কপালটুকু, রক্তিম ঠোঁট, সুঠাম দেহ, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যৌবনোদ্ধত চেহারার দিকে। অসীম শক্তির আধার, মাংসল কাঁধের কাছে এসে তার দৃষ্টি আটকে রইল কিছুক্ষণ সেই বেঁটে গর্দানের উপর। হাঁটুর ওপর রাখা হাত দুটোর কথা মনে হতেই সে ডুবে গেল ভাবনার অতলে। আঙুলগুলোর মাথা ভোঁতা, হাতের মুঠো দেখে মনে হ'ল এক ঘুষিতে ষাঁড়কেও কাত করে দিতে পারে। লরাঁ হচ্ছে খাঁটি কৃষকের ঘরের ছেলে—চলন বলন একটু গেঁয়ো, গোলগাল পিঠ, হাঁটাচলা মাপা-জোখা, মুখের ভঙ্গী কেমন গম্ভীর—একগুঁয়েমীর ছাপও তাতে সুস্পষ্ট। পরিধেয়র নীচে শুধু মাংস আর মাংসপেশীর অজস্র সমন্বয়। কৌতুক ভরে থেরেসা তাকে দেখতে লাগল—কখনো দেখছে তার মুঠো করা হাত দুটোকে, কখনো তার মুখ। ঘাড়ে গর্দানে নজর পড়তেই কেমন শিরশিরে ভয়ের রেশ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

ক্যামিলাস তার বাফোঁর গ্রন্থাবলী দেখালো, দশ সেন্টিনের ধারাবাহিক সংস্করণগুলোও বাদ গেল না। উদ্দেশ্য তার বন্ধু দেখুক—সেও

আকাট মূর্খ নয়—অবসর সময়ে সেও কিছু লেখাপড়া করে। তারপরে যেন নিজেই নিজের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছে এমনি ভাবে বলল :

"আচ্ছা" তুমি ত আমার স্ত্রীকে চেনো? মনে নেই আমার সেই ছোট মামাত বোনের কথা—আমাদের সঙ্গে কত খেলত যে সে!"

"আমি তাকে প্রথমে দেখেই চিনেছি।" উত্তর দিল লরাঁ। তার স্থির দৃষ্টি থেরেসার মুখের উপর।

সেই তীব্র অন্তর্গ্রাসী দৃষ্টির সম্মুখে কেমন অসোয়াস্তি লাগল থেরেসার। জোর করে মুখে হাসির রেখা টেনে সেও দুচারটে কথা বলল লরাঁ ও তার স্বামীর সঙ্গে—তারপরে ছুটে চলে গেল পিসীর কাছে। সহজ সাচ্ছন্দ্য পেলো না আজকের এই পরিবেশে।

এবার সকলের খেতে বসার পালা। স্যুপ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যামিলাসের মনে হল বন্ধুর পিতার কথা। সে জিজ্ঞেস করল :

"তোমার বাবা কেমন আছেন?"

"কেন? আমি তার কোন খবরই রাখি না। আমাদের যে ঝগড়া হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ কাউকে চিঠি পত্র দিই নি।"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কেরাণীটি বলে উঠল—"সে কি কথা!"

"হ্যাঁ, বুড়োর নানা উদ্ভট পরিকল্পনা। সারাজীবন প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মামলা মোকর্দ্দমা করে জেরবার হয়ে আমায় পাঠালো কলেজে। কি না, আমি এক হোমরা চোমরা উকীল হয়ে এসে তাকে সব মামলায় জিতিয়ে দেব। কিসে দু'পয়সা হয় তাছাড়া কোন চিন্তাই নেই বুড়ো লরাঁর। ভুলের ফসলেও যেন ঘরে আসে কিছু—এমনি লোক হল সে।"

ক্যামিলাসও হকচকিয়ে উঠছিল তার কথায়। সে আবার জিজ্ঞেস করল—"তুমি বুঝি তাহলে আইন পড়তে চাওনি?"

"নিশ্চয়ই না।" হাসতে হাসতে জবাব দিল তার বন্ধু। "পুরো

দু'বছর পড়ার ভান করলাম। তা না করলে যে বছরের বরাদ্দ বারশ টাকা জুটত না কপালে। থাকতাম কলেজের একজন ছেলের সঙ্গে। সে ছবি আঁকত। আমিও ভিড়ে গেলাম তার সঙ্গে। শুরু করলাম আঁকা। বেশ ভাল লাগত আঁকতে। হেসে খেলে দিন কাটিত আমাদের—"

রাকুঁয়াদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল তার কথায়।

"তবে দুর্ভাগ্য আমার, বাবার কাছে ধরা পড়ে গেলাম শেষে। তিনি কিছু না বলেই মাসে মাসে হাত খরচের একশ টাকা বন্ধ করে দিলেন। আমায় বললেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে যেন জমিজমা চাষবাস করি। তখন শুরু করলাম দেবদেবীর পট আঁকতে। তাতে আবার পয়সা জোটে না।

"না খেতে পেয়ে মরার সামিল হলাম। শেষে বেগতিক দেখে ছবি আঁকা গোল্লায় দিয়ে চাকুরী খুঁজতে লাগলাম। বুড়োরও আর বেশী দিন নেই—তখন আমায় পায় কে? পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে দিন কাটাব।"

লরার বক্তব্যে এতটুকু জড়তা নেই—চাঁছা-ছোলা কথা। মাত্র কয়েকটি কথায় সে যে বৈচিত্র্যময় কাহিনী বলল—তাতেই তাকে চিনতে কারুর কষ্ট হবে না। মনে মনে সে হল কুঁড়ের বাদশা অথচ কামনা-বাসনা কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। আরামে আমোদে কাটাবার কোন সুযোগই সে ছাড়তে নারাজ। ঐ বিরাট বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে সে কোন কাজ করতে রাজী নয়; শুধু সময় কাটাতে চায় বিলাস-ব্যসনে। জীবনের একমাত্র কাম্য হল—ভাল খাওয়া, ভাল পরা—অতৃপ্ত কামনা-বাসনার চরম আহুতি, অথচ তার জন্যে খাটতে, কি সামান্যতম পরিশ্রম করতেও গররাজী।

আইন ব্যবসায়ে তার ভয় করে—আবার চাষবাসের কথায় হাড়ের গোড়ায় ধরে কাঁপুনি। আলস্য বিলাসে সময় কাটানো সহজ বলে সে

ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছিল। মনে হয়েছিল, তুলির আঁচড় কাটা আর এমন কি ! সহজেই নাম করা যায়। সোফা-কোচে শুয়ে অঢেল মদের পিপেয় গড়িয়ে, অজস্র নারী দেহ উপভোগের মধ্য দিয়ে কাটবে তার দিন। সে সুখস্বপ্ন টিকে ছিল মাত্র ততদিনই বাবা যতদিন টাকা পাঠাতেন নিয়ম করে। দূর দিগ্বলয়ে দারিদ্র্যের নিষ্করুণ ছায়া নামতেই দুশ্চিন্তা এল তরুণের মনে। সে তখন তিরিশ পেরিয়ে এসেছে। বেশ বুঝতে পারল দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার মত মনের জোর তার নেই। আর্টের নামে পেটে বালিশ দিয়ে পড়ে থাকার কর্ম তার নয়। উদগ্র কামনার পরিতৃপ্তির আশায় সে তাই শিকেয় তুলে রাখল তার আর্ট। তার প্রথমকার ছবিগুলো ছিল নিতান্ত মামুলী। তার চাষীর চোখে প্রকৃতিদেবী ধরা দিতেন নোংরা জবুথবুভাবে। সেই কাদায় ছোপা ক্যানভাস দেখে কারুর সমালোচনা করতেও প্রবৃত্তি হত না কোনদিন। তবে এই রক্তে যে বড় আর্টিষ্ট হলে তার অহমিকা ছিল না কোনদিন। তুলি ছেড়ে দেবার সময় তাই দুঃখও হয় নি এতটুকু। দুঃখ হল তার বন্ধুর সেই বিরাট ষ্টুডিও ছেড়ে আসবার জন্যে। ষ্টুডিওতে সে কত না বিলাসসহচরী নিয়ে দিন কাটিয়েছে। মনে পড়ল মডেলদের কথা। তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের দানেই ছিল সে রমণীকুল অধিগম্য। আজ সেই পাশবিক লালসাময় জীবন হয়ে পড়েছে তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও কেরাণীজীবন তার মন্দ লাগে না। বেশ মানিয়ে নিয়েছে সেখানের বোকা-বোকা পরিবেশের সঙ্গে ; আর ঐ সামান্য কাজে তার ক্লান্তিও আসত না তেমন। বরঞ্চ ভালই লাগত। শুধু দুটি জিনিসের অভাবে বিরক্তি লাগত তার। লালসার সঙ্গী নারী সাহচর্যের অভাব আর আঠারো-সু পাইস হোটেলের খাওয়া। এটুকু খাবারে তার মত বক রাক্ষসের কি খিদে মেটে।

ক্যামিলাস একদৃষ্টিতে ছিল তার দিকে তাকিয়ে। মন দিয়ে

শুনছিল তার কথা। বেশ মজাও লাগছিল। তার রোগজীর্ণ দেহে কামনা-লালসার ছোঁয়াচ ত সে পায়নি মুহূর্তের জন্যও।

বন্ধুর লালসা মুখর স্টুডিও জীবনের কাহিনী সে শুনতে লাগল অটুট একাগ্রতায়। নগ্ন নারী দেহের মাংসল বিকাশের ছবি ভেসে উঠল মনে। সে লরাঁকে প্রশ্ন করল ঃ

"সত্যি বলছ, মেয়েগুলো তোমার সম্মুখেই জামা-কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পড়ত ?" কৈশোর-কৌতুক তার চোখেমুখে।

"না ত কি", উত্তর দিত লরাঁ হাসতে হাসতে। বলেই তাকাত থেরেসার দিকে—সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

"আমার যেন কেমন কেমন লাগে" বলল ক্যামিলাস, "আমি ত পারতাম না....প্রথমবার তোমারও কেমন কেমন লাগেনি, কি বল ?"

লরাঁ নিজের হাতের দিকে তাকিয়েছিল। ক্যামিলাসের কথায় আঙুলগুলো সংকুচিত হল মাত্র, গালে লজ্জার আভা গেল খেলে।

কতকটা স্বগত ভাবেই বলল ঃ "প্রথমবার ? না আমার ত বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল। এটা যে ভীষণ মজার ব্যাপার। তবে শুধু পয়সাই খরচ হয় এর পেছনে। একটি যে মেয়ে মডেল ছিল না আমাদের, তার কথা কি বলব। যেমন দুধে-আলতায় গোলা রং, তেমনি নধর মাংসল দেহ ; যেমন সুপুষ্ট সুডৌল স্তন তেমনি চওড়া পেছনটা—এই যাকে বলে গুরু নিতম্বিনী আর কি।"

মাথা তুলতেই লরাঁর নজর পড়ল সামনে বসা থেরেসার উপর—স্তব্ধ নিশ্চল প্রতিমূর্তির মত বসে আছে সে। এক মনে তার দিকে তাকিয়ে গোগ্রাসে গিলছে তার কথা। চোখ দুটিতে অতলস্পর্শী দৃষ্টি—অর্ধস্ফুট অধরোষ্ঠে খেলছে গোলাপী আভা। আবেশ-বিহ্বল সে মূর্তি ; ব্রীড়াবনতা, সংকুচিতা, তবু না শুনে পারছে না সেই লালসা-পংকিল কাহিনী।

থেরেসার দিক থেকে ক্যামিলাসের দিকে ফেরাল তার দৃষ্টি। অতীতের শিল্পীর মুখে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল একটি অবদমিত হাসির রেখা। কামনা-কলুষ দেহভঙ্গী করে কথাটি শেষ করল সে। এবারও তরুণীর দৃষ্টি অনুসরণ করল তার সেই দেহভঙ্গীকে। খাবার দেওয়া হয়েছে। মাদাম রাকুঁয়া নীচে গেছেন এক খরিদ্দারকে তোয়াজ করতে।

পরে টেবিলের চাদর উঠিয়ে নিলে, অন্যমনস্ক লরা হঠাৎ ক্যামিলাসকে বলল: "তোমার একটা অয়েল পেন্টিং করে দেব আমি।"

মাদাম রাকুঁয়া আর তার ছেলে দুজনেরই প্রস্তাবটা খুব ভাল লাগল। থেরেসা রইল চুপ করে।

"এখনো গরম আছে," পুরানো সূত্র ধরে লরা আরম্ভ করল: "আমরা দুজনেই ত অফিস থেকে বেরোই চারটায়; তখন স্বচ্ছন্দে বাসায় আসতে পারি। তুমিও রোজ বিকেলে ঘণ্টা দুই ধরে বসতে পারো। সপ্তাহ খানের মধ্যেই আঁকা শেষ হয়ে যাবে।"

'বেশ'—উপচে উঠল ক্যামিলাস। আনন্দে, লজ্জায় লাল হয়ে বলল: "তুমি আমাদের সঙ্গে তাহলে রোজ রাতে খাবে। আমি ইতিমধ্যে চুলটা কোঁকরা করে নেব আর কালো ফ্রক কোটটা পরব।"

আটটা বাজল। গ্রীভে আর মিশ'ও হাজির। একটু পরেই ঢুকলো সুজানকে সঙ্গে নিয়ে অলিভার।

ক্যামিলাস বন্ধুটিকে আসরের সবাই-এর সঙ্গে পরিচিত করে দিল। গ্রীভে মুখ বাঁকিয়ে নিল। লরাকে সে মনে মনে ঘৃণা করত। বড় তাড়াতাড়ি যেন তার মাইনে বেড়েছে। তাছাড়া আসরের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়াটাই যেন কেমন কেমন। নবাগতের প্রতি স্বাগতভাব পোষণ না করাই স্বাভাবিক মাদাম রাকুঁয়ার অতিথিদের।

লরা এতে কিছুই মনে করেনি। অবস্থা বুঝে নিজে থেকে যেচে স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টির দিকে দিল নজর। গল্পের পর মজার গল্প

করে দেখতে না দেখতে আসর ফেলল জমিয়ে। এমন কি গ্রীভের বিরুদ্ধতাও কাটিয়ে উঠল সে।

সে দিন সন্ধ্যেয় থেরেসা নীচে আসার চেষ্টা করেনি একটিবারও। পাশা খেলে, গল্প করে এগারটা পর্যন্ত বেশ কাটিয়ে দিল ঠায় চেয়ারে বসে; অক্লান্ত চেষ্টায় লর‍্যার দৃষ্টিপথের বাইরে রাখলো নিজেকে। অবশ্য অকারণ ছিল সে সাবধানতা। ভুলেও লর‍্যা বারেক তার দিকে তাকাবার চেষ্টা করেনি। নবাগত তরুণের পুরন্ত গলা, পুরুষ প্রকৃতি, অট্টহাসি, ঘামের তীব্র গন্ধ কেমন অধীর চঞ্চল করে তুলল এই তরুণীকে—পাগল-পাগল আবেশ-বিভোল হয়ে উঠল সে।

ছয়

সেই অবধি লর‍্যা রোজ সন্ধ্যেয় আসতে লাগল মাদাম ব্রাকুঁয়ার বাসায়। মাসে আঠারো ফ্রা ভাড়া দিয়ে সে আসবাব পত্র দিয়ে সাজানো একটি ঘরে থাকত ওয়াইন পোর্ট ছাড়িয়ে রু স্যাঁ ভিক্তর রাস্তার উপর। ওপরের স্কাই লাইট থেকে আলো আসে সে ঘরে। সর্বসাকুল্যে ঘরটি হবে বড় জোর আঠারো বর্গফুট। এই চিলে কোঠায় যত দেরী করে পারে সে ফিরত। ক্যামিলাসের সঙ্গে পরিচয়ের আগে সে তার রাতে খাবার রেস্তোরাঁতেই বসে বসে সময় কাটাতো। অন্য কোথাও যাবার চুলো ছিল না তার। তিন সু দিয়ে ব্র্যাণ্ডি মেশানো কফির পেয়ালা নিয়ে পাইপ টানতো সারাক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসত রু স্যাঁ ভিক্তরের পথে।

পাসাজ দু পঁন্যুর দোকান ঘর তো তার কাছে স্বর্গ। আনন্দোচ্ছল

পরিবেশে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে সে সময় কাটাতো এসে। নিজের গাঁট গচ্চা দিয়ে তিন „স্যু-মার্কা পচা কফিও খেতে হয় না—তার বদলে মাদাম রাকুঁয়ার চমৎকার সোনালী চায়ের পেয়ালা! ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে দশটা না বাজা পর্যন্ত উঠতোই না সে। তারপর ক্যামিলাসকে দোকান বন্ধ করার সাহায্য করে সে কেটে পড়ত।

একদিন বিকেলে সে ইজেল আর রং-এর বাক্স নিয়ে এল। পরদিন থেকেই ক্যামিলাসের ছবি আঁকতে শুরু করবে। ক্যানভাস কিনে এনে সব কিছু গোছ-গাছ করতে বসল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল স্বামীস্ত্রীর শোবার ঘরেই সে আঁকবে। ওঘরে নাকি আলো আসে বেশী।

মাথার স্কেচ করতেই তার লাগল পুরো তিনটে দিন। আঁকাটা কেমন রুক্ষ মনে হচ্ছিল। দুর্বল হাতে ক্যামিলাসের মাথাটা আঁকল সে। মুখের সব কিছুরই নিখুঁত অনুকৃতি করা হল। তবু কেমন যেন কোথায় ঘটল ছন্দপতন। সব দেখে মনে হয় গম্ভীর ভ্রূ-কোঁচকানো মুখের ভাব তার। চতুর্থ দিনে সামান্য একটু রং বুলালো সেই ছবির উপর। ক্যানভাসের এদিক-সেদিক লাগিয়ে দিল কয়েক ছোপ রং।

প্রত্যেক দিনের বসা শেষ হয়ে গেলে মাদাম রাকুঁয়া আর ক্যামিলাসকে ভারী খুশী দেখা যেত। লর‍াঁ তাদের ততই ধৈর্য ধরতে বলত। বোঝাত যে সাদৃশ্য আসবে আরও পরে।

ছবি আঁকা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে থেরেসা প্রায় সব সময়ই থাকত শোবার ঘরে—এখন যেটা পরিণত হয়েছে স্টুডিওতে। পিসীমা একাই থাকতেন কাউন্টারের পিছনে। সামান্য অজুহাতে থেরেসা উপরে উঠে এসে একমনে দেখত লর‍াঁর কাজ।

সদা গম্ভীর, ক্লিষ্ট, পাণ্ডুর মুখে সে চুপ করে বসে লর‍াঁর প্রতিটি তুলির রেখার তির্যক গতিপথ অনুসরণ করত একাগ্র সাধনায়। এটা যে তার খুব ভাল লাগত না নয়; কিসের চুম্বকী-আকর্ষণ যেন তাকে

টেনে এনে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আটকে রাখত সেখানে। কখনো কখনো লরঁা তার দিকে ফিরে একটু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করত কেমন লাগছে ছবি। কদাচিৎ সে তার কথার জবাব দিত। জবাব না দিলেও সারা শরীরে অনুভব করত আবেশ ; সে আবার ডুবে যেত নিজের মাঝে।

রোজ রাতে বাড়ী ফেরার পথে লরঁা নিজের মনের সঙ্গে করত দীর্ঘ কথোপকথন। কথোপকথনের মূল সূত্রই ছিল—সে থেরেসার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করবে কিনা।

নিজের মনেই বলত : "ইচ্ছে করলেই ত মেয়েটিকে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াতে পারি। সব সময়েই আমার পেছনে এসে দাঁড়ানো চাই, একদৃষ্টে আমায় দেখা চাই....। মেয়েটার যেন শরীর কাঁপে, চোখে কেমন চাপা কামনার ছাপ ! তারও যে নাগর দরকার তা না বললেও চলে। চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়—কথাটা সত্য কিনা !....ক্যামিলাসকে দিয়ে ওর কোন সুখ-সাধই বোধ হয় মেটে না।"

রোগজীর্ণ ক্যামিলাসের কথা মনে হতেই হাসি পেল লরঁার। তারপর আবার....

"দোকানে বসে থাকতে থাকতে নিশ্চয়ই ও প্রাণান্ত।....যাবার অন্য কোন চুলো নেই বলেই ত আমিও সেখানে যাই। তা নাহলে কোন শালা যেত পাসাজ দু পঁ ন্যুতে। যেমন স্যাঁতসেঁতে তেমনি নোংরা। যে-কোন মেয়ে ওখানে থাকলে নির্ঘাত মারা যাবে।.... সেও আমাকে চায় যেন হিসেবে ভুল হয়নি এতটুকুও। অন্যের কোলে তুলে দেওয়ার চেয়ে কেন তবে নিজের বুকেই টেনে নিই-না তাকে !"

নিজের ক্ষমতার কথা ভেবে প্রসন্ন মনে সে স্তব্ধগতি দাঁড়িয়ে পড়ল সীনের তীর ধরে আনমনা ভাবে। ভাবল,

"কেন নেব না ? পয়লা সুযোগেই তাকে চুমো খেলে—বাজী রাখতে পারি, সে তখুনি ঢলে পড়বে আমার হাতে।"

আবার চলতে সুরু করল সে। এবার অনিশ্চয়তার ছোপ মনে।

"কিন্তু দেখতে কেমন যেন বিশ্রী লাগে। নাকটা একটু লম্বা না—মুখটা চোয়াড়ে। তা ছাড়া তাকে দেখে ত আমার প্রেমের প'ও জাগে না মনে। তবে বাবা কেন আবার অযথা জড়ানো? থাকগে তার চেয়ে।"

স্বভাবচতুর লরঁা পুরো এক সপ্তাহ মাথা ঘামাল এর পেছনে। থেরেসার সঙ্গে নটঘটি করার ভালমন্দ সব কিছুই খুব ভাল করে বিবেচনা করল; তারপরে যখন বুঝতে পারল এতে লাভ বই লোকসান নেই তখন সে স্থির করে ফেলল মন।

ঠিক, থেরেসাকে তার কুৎসিৎ মনে হয়। আর সে তাকে ভালও বাসে না। কিন্তু তাহলে কি হয়—তার পেছনে ত পয়সা খরচ করতে হবে না তাকে। পয়সা দিয়ে যে-সব মেয়েকে সে উপভোগ করেছিল তারাও কেউ ত ডানাকাটা পরী নয়—কিংবা সেও তাদের প্রেমে পাগল হয়ে যায় নি। পকেটের কথা মনে করেই সে বন্ধুর স্ত্রীর দিকে নজর দেওয়া ঠিক করল। ফাঁকা পকেট সেজন্য জৈব ক্ষুধার উপশম ঘটে নি বহুকাল। এমন সুযোগ পেয়ে তাই হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হল না তার। আর এসব ব্যাপার এমন ভয়ের কিই বা আছে। নিজের গরজেই থেরেসাকে চেপে যেতে হবে সব কিছু। ইচ্ছে হলে সেও তাকে ছেড়ে চলে আসতে পারবে। যদি ক্যামিলাসের কাছে সে ধরাও পড়ে—তা হলে তাকে ঠাণ্ডা করতেও বেশী বেগ পেতে হবে না। সবদিক বিচার করে লরঁার পক্ষে এ ব্যাপারটা বেশ লোভনীয় বলেই মনে হল।

সেই থেকে উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে সে রইল অবিচল ধৈর্যে। প্রথম সুযোগেই কাজ হাসিল করা ঠিক করল সে। তখনকার অনাগত সন্ধ্যের আয়েসী পরিবেশের কল্পনায় তার মন ভরপুর হয়ে উঠল। রাকুঁয়ারা সবাই খাটবে তার মনোরঞ্জনের জন্য—রক্তের জ্বালা নেভাবে

থেরেসা, মাতৃ-স্নেহে ডুবিয়ে রাখবে মাদাম রাকুঁয়া, দোকানের বিরক্তিকর পরিবেশকে হাল্কা করে দেবে ক্যামিলাসের সাহচর্য!

ছবি আঁকা শেষ হয়ে এল তবু কোন সুযোগ এল না। থেরেসা সর্বদাই থাকে সেখানে—তেমনি ক্লিষ্ট—তেমনি অস্থির। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ক্যামিলাস ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না। তাকে ঘণ্টা খানেকের জন্যও বাইরে পাঠাতে না পেরে লরাঁ হতাশ হয়ে উঠেছিল। অবশেষে তাকে একদিন বলতেই হল এবার ছবি আঁকা শেষ হবে। মাদাম রাকুঁয়া সঙ্গে সঙ্গে বললেন তিনি তাহলে খাইয়ে দেবেন সবাইকে।

পরদিন তুলির শেষ ছোঁয়াচ বুলোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সকলে ছবি দেখে চেঁচিয়ে উঠল। লাল লাল ছোপ লাগানো, কেমন কুৎসিত নোংরা পশ্চাৎপটে আঁকা ছবি। লরাঁর হাতে চটকদার রংও দেখাত মেট-মেটে। ক্যামিলাসের মুখখানা দেখতে জলে ডোবা মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে। অপটু হাতের রেখায়—এ সাদৃশ্য আরও প্রখর হয়ে ফুটে বেরুতে চাইল ছবি থেকে। কিন্তু ক্যামিলাস ভারী খুশী।

ভাল করে চোখমুখগুলো দেখে নিয়ে সে বলল, বন্ধুদের জন্য দুবোতল শ্যাম্পেন আনতে যাবে সে। মাদাম রাকুঁয়া গেলেন দোকানে চলে। শিল্পী রইল একা থেরেসার সঙ্গে।

তরুণী শূন্যে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়েছিল নিজের জায়গায়। কিসের যেন অপেক্ষা করছে সে কম্প্রবক্ষে। লরাঁর ইতস্তত ভাব। তুলি নিয়ে দু' চারবার নাড়াচাড়া করল। হাতে সময় বেশী নেই; ক্যামিলাস যে কোন মুহূর্তেই ফিরতে পারে; আর হয়ত এ সুযোগ আসবে না জীবনে। হঠাৎ ফিরে ঘুরে দাঁড়াল শিল্পী—সম্মুখে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থেরেসা। কয়েক সেকেণ্ড দুজনে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দু জনের দিকে।

তারপর নীচু হয়েই লরাঁ সবল আকর্ষণে টেনে নিল তরুণীকে নিজের বুকে। পরুষ ঠোঁটের নির্মম পেষণে তরুণীর অধরোষ্ঠ পিষ্ট করবার সময়ে

তার মাথা পড়ল হেলে। আলিঙ্গন মোচন করবার প্রচণ্ড আরণ্যক চেষ্টা করল সে! তবে ক্ষণিকের প্রচেষ্টা মাত্র। পরমুহূর্তে এলিয়ে দিল নিজেকে—ঢলে পড়ল তরুণী টালির মেঝেয়। নির্বাক পাশবিকতায় পরিসমাপ্তি হল আদ্যোপান্ত ঘটনার।

সাত

শুরু থেকেই প্রেমিক যুগলের বদ্ধমূল ধারণা তাদের ঐ অবৈধ প্রেম ঘটেছে বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দেশে। অনিবার্য তার গতি—আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এর পরিণতি। প্রথম যেদিন তারা একসঙ্গে কাটায় সেদিনই তারা কথা কয়েছিল বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুরে; সামান্যতম বিব্রত কি লাজ-লজ্জার পাট না রেখেই বর্ষণ করেছিল চুম্বনের ধারা যেন কতদিনের ঘনিষ্ঠতায় স্বাভাবিক হয়েছে এ মিলন। এই নূতন সম্পর্কের নির্লজ্জতার মধ্যেও তাদের এল সহজ প্রশান্তি।

মিলনাভিসারের পন্থা ঠিক করে নিল তারা নিজেরা। থেরেসার বাইরে যাবার উপায় নেই; তাই লরাঁকেই আসতে হবে তার বাড়ী। স্থির গম্ভীর গলায় তরুণী বুঝিয়ে দিল তার পরিকল্পনা। যে ঘরে সে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী সেই ঘরেই ঘটবে তাদের মিলন। ঘর থেকে যে বারান্দা গিয়ে পাসাজ-এ পড়েছে সেই পথে আসবে তার প্রেমিক; আর সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে এসে দরজা খুলে দেবে। তখন ক্যামিলাস থাকবে অফিসে, মাদাম রাকুঁয়া নীচের দোকানে। এত দুঃসাহসী বলেই পরিকল্পনাটির সাফল্য ছিল নিশ্চিত।

লরাঁ রাজী হল। যত হিসেবীই হ'ক না কেন, তার মধ্যে একটি দুঃসাহসী মনও ছিল সুপ্ত—বাহুবলে বলীয়ান ব্যক্তির নির্ভীকতা।

প্রেমিকার ব্যগ্র প্রশান্ত আত্মাহুতির আবেদনের লালসা-মুখর উপভোগের নেশায় পাগল হয়ে উঠল সেও। একটা ছুতো করে অফিসের বড়বাবুর কাছ থেকে দু' ঘণ্টা ছুটি নিয়ে দ্রুত পায়ে চলে এল পাঁসাজ দু পঁ ম্যুতে।

পাসাজ-এ পা দিতে না দিতেই উত্তপ্ত কামনার উদগ্রজ্বালা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। নকল জহরত যিনি বিক্রী করেন সেই মহিলাটি দরজার ঠিক মুখোমুখী বসেছিলেন। কোন একটি মেয়ে আংটি কি একজোড়া তামার ইয়াররিং কিনতে না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল। তার পরেই তড়িৎ গতিতে আঁধারে ঘেরা সংকীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে গা ঘষতে ঘষতে কোনও রকমে বারান্দায় উঠে এল সে। পাথরের সিঁড়িতে আওয়াজ হচ্ছে প্রতি পদক্ষেপের না কে যেন ছুরি মারছে তাকে। একটি দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে দেখল থেরেসাকে—পরনে ড্রেসিং জ্যাকেট আর পেটিকোট, আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। একরাশ চুলের টানা খোঁপা মাথার পেছনে। দরজা বন্ধ করেই লরাঁর কণ্ঠলগ্না হল সে। সদ্য মার্জিত দেহ ও শুভ্র পরিধেয়ের মিষ্টি গন্ধ আসছে নাকে!

লরাঁ বিস্ময়ে হতবাক। সে প্রেয়সীকে মনে হল পরম লাবণ্যবতী। এ যেন অনাস্বাদিতপূর্বা সম্পূর্ণ অপরিচিতা তার। কমনীয় দেহের কামনা-ব্যাকুল দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল তাকে থেরেসা। কামার্ত তৃষিত হাসির উত্তপ্ত আবেশ সারা চোখেমুখে। এ হল প্রেমবিধুর নায়িকার মুখছবি—আমূল রূপান্তর ঘটেছে তার। একাধারে জান্তব লোলুপতা ও মাধুরিমার অপূর্ব সমাবেশ; আর্দ্র অধরোষ্ঠ, উজ্জ্বল চাহনি ও দেদীপ্যমান মুখাবয়ব। আবেগ-ব্যাকুল, শিহরণ কাতর নায়িকা এখন অলোকসামান্য সৌন্দর্য-গরিমায় মহিমময়ী। এ ত নশ্বর সৌন্দর্য্য নয়—অত্যুগ্র কামনারই রূপায়ন যেন। মনে হবে অকস্মাৎ কোন এক অন্তর্দাহে ভাস্বর হয়ে উঠেছে তার মুখাকৃতি, লেলিহান শিখার নাচন সেই তনুদেহ ঘিরে। তারই আগুন-

ধরা রক্তের নাচনে, শিহরিত স্নায়ুর ঝলকে, হাওয়ার কবোষ্ণ মাতনের মূর্চ্ছনা তার চারিপাশে—বড় তীব্র, বড় ঝাঁঝালো সে পরিবেশ।

প্রথম চুম্বনেই রপ্ত নাগরীবৃত্তির পরিচয় দিল সে। প্রেমবুভুক্ষু দেহ মুহূর্তে তলিয়ে গেল কামনার কালীয় দহে। কোন স্বপ্নসম্ভবা বাসনায় বিলীন জীবন যেন তার। রোগশীর্ণ ক্যামিলাসের দুর্বল বাসনালিঙ্গনের পরিবর্তে মহাবাহু লর্াঁর বক্ষলগ্না সে। বীর্যবানের সবল আলিঙ্গনের তড়িৎস্পর্শে জেগে উঠেছে সে প্রসুপ্ত কামনার জড়নিদ্রা থেকে। শিরায় উপশিরায় ধমনী প্রবাহে প্রেম ব্যাকুলা নায়িকার আকুতি পড়ল ফেটে; তার কুমারী দেহের বুভুক্ষু ধমনীতে মাতার আফ্রিকান রক্তের দোলা—শিরা-উপশিরায় ধরল লালসার তীব্র দাহ। পায়ের নখ থেকে কেশাগ্র অবধি কামনার শিখার মত ঘন ঘন কাঁপছে যেন।

এ জাতীয় পাগল করা অভিজ্ঞতা ছিল না লর্াঁর। সে হতচকিত—অসোয়াস্তি লাগছে তার। নিস্পৃহ চুম্বন, নির্জীব প্রেমের অভিনয়ই সে পেয়ে এসেছে এতদিন তার অভিসারিকার কাছ থেকে। থেরেসার ক্লান্ত দীর্ঘায়িত শ্বাসপ্রবাহে, তার প্রেমাভিনয়ের প্রখরতায় সে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে চরম আনন্দও পেল সে। তরুণীর ঘনালিঙ্গন ছেড়ে যখন বেরিয়ে এল, মাতালের মত টলছে তার পা।

পরদিন তার স্বভাবসুলভ হিসেবী মনোবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। যে প্রেমিকার হিংস্র চুম্বনে কাল সে পেয়েছিল পরম পুলক—আর কখনোও দেখা করবে কিনা তার সঙ্গে—এটাই এখন হল তার সমস্যা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল—বাড়ী ছেড়ে সে এক পাও নড়বে না। তবে সময়ে ? ক্রমেই তার প্রতিজ্ঞার ভিৎ আল্‌গা হতে লাগল। ভুলে যেতে চাইল থেরেসাকে—নগ্নতার কামাতুর পরিবেশে চাইল না তার সম্ভোগ। মুছে ফেলতে চাইল সে মধুর তীব্র প্রেমালিঙ্গনের স্মৃতি। কিন্তু তবু নিষ্কৃতি কোথায়? ঐ ত পুলকবিধুর অবিকম্প থেরেসা রয়েছে হাত

বাড়িয়ে—তাকে ডাকছে সমস্ত শরীরের চাঞ্চল্যে ? থেরেসার কল্পনাতেই সে অনুভব করল তীক্ষ্ণ শারীরিক ক্লেশ, অসম্ভব মনে হল সে দেহ-সম্ভোগ বিরতি !

তার সংকল্প হল শিথিল। আর একটি অভিসার তিথির ব্যবস্থা করে সে পাসাজ দ্যু পঁ ন্যুতে !

সে দিন থেকেই থেরেসা অঙ্গাঙ্গী হয়ে উঠল তার জীবনে। মনে প্রাণে তাকে তখনো গ্রহণ না করলেও—সে যে তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—এ বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না ! বিভীষিকার মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গেই তার হিসেবী মনটাও হত সজাগ। তবু এ প্রণয়াভিসারের তরঙ্গ-দোলায় তার অস্বস্তি কাটল না কিছুতে। অবশেষে উদগ্র কামনার মুখে ভেসে গেল সে ভয়-ভীতি, হিসাব নিকাশের সমস্ত অস্বস্তি। অভিসারের সংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল ততই কামনার উগ্রতায় উদগ্র হতে লাগল সে মিলন।

এসব কোন সংশয়ই ছিল না থেরেসার মনে। দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে সে ভেসে চলল কামনার সব ডোবানো স্রোতে। ঘটনাচক্রে যে রমণীকে এতদিন মনের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা রাখতে হয়েছিল অবদমিত, আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সুপ্ত বাসনা নগ্নরূপে দেখা দিল; সেও ডুবে রইল চরম সম্ভোগে। কখনো লরাঁর গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকিয়ে দ্রুতলয়ে নিশ্বাস নিতে নিতে বলত :

"কি কষ্টে যে আমার জীবন কেটেছে তা যদি জানতে। রোগীর ঘরের ভ্যাপসা আবহাওয়ায় হয়েছি মানুষ। ক্যামিলাসের বিছানায় শুতাম ঠিকই। তবে রাতে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতাম। ওর গা দিয়ে কি বিশ্রী গন্ধ বেরোয়—তাতে বমি আসত আমার। যেমন হিংসুটে তেমনি একগুঁয়ে আবার সে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে না খেলে—সে কিছুতেই ওষুধ খেত না। পিসীর মন যোগানোর জন্য আমাকেও খেতে

হত যত রাজ্যের ওষুধ। কি করে যে এখনও বেঁচে আছি তাই ভাবি····। তারাই আমার রূপ যৌবন নিয়েছে কেড়ে—আমায় করেছে রিক্ত, সর্বহারা! তাই সব হারিয়ে আমি তার বদলে বুঝেছি ভালোবাসার কি দাম—তুমি কিছুতেই আমার মত ভালবাসতে পারবে না কখনো।"

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ত সে। চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে দিত লরঁাকে। তারপর আবার শুরু করত ঃ

"আমি তাদের কারুই কোন ক্ষতি করতে চাই না। তারা আমায় আশ্রয় দিয়েছে, লালন পালন করেছে········। কিন্তু এদের আশ্রয়ে থাকার চাইতে যেন আমার অনাথা জীবনই ছিল ভাল। হাওয়া বাতাসের জন্য গুমরে মরতাম সব সময়। ছোটবেলাতেও মনে মনে কত স্বপ্ন দেখতাম—বেদেনীদের মত খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি করব, তাদের মত ভিক্ষে করে পথে পথে দিন কাটাব। শুনেছি আমার মা ছিলেন আফ্রিকার একটি সম্প্রদায়ের নেতার মেয়ে। কতকাল তাঁর কথা ভেবেছি। রক্তের' অনুতে অনুতে, প্রবৃত্তির পরতে পরতে অনুভব করেছি নিজেকে তাঁর মেয়ে বলে। তাঁকে ছাড়তে না হলে যে কি মজা হত। হয়ত তাঁর পিঠে চড়ে ধূলোর ঝড়ের ভেতর পার হতাম আমরা দুর্জয় সব মরুভূমি।····কি ভাবে কাটত ছোটবেলা! বদ্ধ ঘরে ক্যামিলাসের হাঁফানির শব্দ শুনে দিন কাটার কথা মনে হলে এখনও সারা গা রী রী করে ওঠে। উনুনের সামনে উবু হয়ে বসে জ্বাল দিয়েছি তার পাঁচন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেছে ব্যথায়। নড়বার চড়বার উপায় ছিল না। তাহলে পিসীর শাসন আসত ঝড়ের বেগে। এতটুকু শব্দ হলেও রক্ষে ছিল না।····নদীর পারের বাড়ীতে এসে একটু মুক্তির আলো দেখেছিলাম। তবে তখন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে গিয়েছিল অসাড়। কোনও ক্রমে হাঁটা চলা করতে পারলেও দৌড়তে পারতাম না। তারপরে তারা আমায় জীবন্ত কবর দিল এই দোকানে।"

গভীর নিঃশ্বাসে থেরেসা দয়িতকে টেনে নিল দৃঢ়তর আলিঙ্গনে—এত দিনে সে নিচ্ছে প্রতিশোধ। উত্তেজনায় নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল ঃ

"ওগো—তুমি বিশ্বাস করবে না—অধঃপতনের কোন সীমায় তারা এনে ফেলেছে আমায়। আমায় করেছে কপটাচারী—মিথ্যাবাদী....। তাদের বুর্জোয়া জীবনের ঠুনকো চটকের চাপে আমায় মারতে চেয়েছে শ্বাসরোধ করে। কি করে যে এখনো ধমনীতে বয়ে চলেছে রক্তপ্রবাহ—তাও জানি না....মাটীর দিকে সারাক্ষণ চোখ নীচু করে, তাদের মতই বোকাবোকা মুখ করে—ঐ এক নিরানন্দ জীবন কাটাতে হত আমাকেও। তুমিও যখন প্রথম দেখ আমায় গবেট বলে মনে হয়নি? আমি ছিলাম ম্লান আর মুমূর্ষু। জীবনে কোন সাধই আমার ছিল না। ভাবতাম কবে যে সীনের গভীর কাল জলে ডুবে সকল জ্বালার সব ঘুচাবো! এখানে আসা নিয়ে কত ঝড় ঝঞ্ঝা গেছে আমার মাথার উপর দিয়ে....ভারঁনতে ফিরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কত কেঁদেছি। মনে মনে নিজেকে অভিশাপ দিয়েছি ভীরু বলে। রক্তে তখন বিদ্রোহের বান ডেকেছিল, সারা শরীর ছিঁড়ে কুঁড়ে খান খান করে ফেলতে ইচ্ছে হত। দু দুবার ভেবেছি যে দিক দু চোখ যায় পালিয়ে যাব—একবারও সাহসে কুলোয় নি। অসহ্য আদরে, চিট্‌চিটে মায়ায় মজে পোষা জানোয়ারের মত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকেই চলেছে আমার মিথ্যাচারের খেলা। শুধু মিথ্যেই বলেছি। এখানে থেকেছি শান্ত-শিষ্টের মত—আর মনে মনে ভেবেছি সব আঁচড়ে কামড়ে ভেঙেচুড়ে তছনছ করে দিই।"

উত্তেজিত তরুণী একটু থামল। গভীর আর্দ্র চুম্বনের দাগ এঁকে দিল লরাঁর ঘাড়ে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শুরু করল ঃ

"নিজেই জানি না ক্যামিলাসকে কেন বিয়ে করতে রাজী হলাম। কেমন ঘেন্না আর অনাসক্তির জন্যে প্রতিবাদও করতে ইচ্ছে হয় নি। সে

বেচারা ত একেবারে বাচ্চা—দেখলে মায়া হয়। খেলার সময় তার গায়ে হাত লাগলে মনে হয়েছে তুলতুলে কাদায় হাত বসে গেছে আমার। পিসী সম্প্রদান করেছিল বলেই তাকে গ্রহণ করি—কোনদিন আমার জন্যে তাকে কোন অসুবিধায় ফেলতে চাইনি।....ছয় বছর বয়সে যার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছি আবার সেই রুগ্ন ছেলেকেই পেলাম স্বামীরূপে। ঠিক তেমনি রোগা, তেমনি খিটখিটে—গায়ে ঠিক তেমনি রোগের গন্ধ যাতে চিরকাল আমার গা বমিবমি করেছে।....এত সব কথা তোমায় বলছি এজন্য যে তুমি আমায় ভুল বুঝো না।....বিরক্তিতে, ঘৃণায় দম আটকে আসত। যত ওষুধ খেয়েছি—তার কথা মনে হতেই পাশ ফিরে শুয়েছি—কি সব রাত গেছে তখন। কিন্তু তুমি। তুমি....” এবার থেরেসা উঠে বসল। লরাঁর বিশাল হাত দুটি আঁকড়ে ধরে আছে তাঁর আঙ্গুলগুলো। লরাঁর প্রশস্ত চোখ আর সবল ঘাড়ের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগল :

“তুমি! তোমায় যে কি ভালই বাসি! যেদিন ক্যামিলাস তোমায় দোকানে নিয়ে এল তক্ষুনি ভালবেসেছি তোমায়।....হয়ত এত সহজে তোমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি বলে মনে মনে ঘৃণা করছ আমায়। সত্যি কথা বলতে কি, কি হল কিছুই জানি না। আমি অহংকারী—বদমেজাজী। যেদিন তুমি জোর করে আমার চুমু খেয়ে এ ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দিয়েছিলে—সেদিন ইচ্ছে করছিল তোমায় মারতে। ....অথচ কি করে যে তোমায় ভালবেসে ফেললাম তা কে বলবে। তোমায় কিন্তু ঘেন্নাই করছিল বেশী। তোমায় দেখলে বিরক্তি লাগত—কেমন অস্বস্তি বোধ হত আমার। তুমি এখানে এলেই আমার কেমন সব ঘুলিয়ে যেত, শিরা উপশিরা উঠত চঞ্চল হয়ে, মাথা গরম হয়ে চোখের সম্মুখে দৃষ্টি যেত ঝাপসা হয়ে। ওঃ! সে কি যাতনা! তবু মনে মনে চেয়েছি সে যাতনা—প্রতীক্ষা করেছি তোমার—তোমার চেয়ারের চার-

পাশে ঘুর ঘুর করেছি যাতে তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটু ছোঁয়াচ লাগে আমায় গায়ে—তোমার কাপড়চোপড়ের ঘসা লাগে আমার পোশাকে ! মনে হয়েছে আমি পাশ দিয়ে গেলে তোমারও রক্তে ধরেছে আগুন। এক জ্বলন্ত মেঘের আকর্ষণেই এসেছি তোমার কাছে—যত বাধাবিপত্তি দ্বন্দ্ব সব চাপা পড়ে গেছে তলিয়ে।....যখন এখানে বসে থাকতে, মনে পড়ে সে সব কথা তোমার ? বিধাতার অলজ্ঘ্য বিধান বারে বারে আমায় টেনে এনেছে তোমার পাশে, ঝাঁঝালো আনন্দে পান করেছি তোমার পরিবেশ। একটা চুমুর কাঙাল ছিলাম আমি—দাসত্বের হীনতায় ছিলাম মুহ্যমান—মনে হত তোমার সামান্যতম স্পর্শেই ঘটবে পতন! কিন্তু সেই দুর্বলতার কাছেই ত শেষে করলাম আত্মসমর্পণ। প্রতীক্ষায় রইলাম কখন তুমি আমায় টেনে নেবে তোমার ঐ চওড়া বুকের মধ্যে !....

নিশ্চুপ হল থেরেসা—প্রতিশোধ নেওয়া যেন পূর্ণ হয়েছে তার। টেনে নিল লর‍াঁকে তার উদ্দাম উত্তাল বুকে ! তারপর চলল সেই হিমশীতল ঘরে রূপের নেশায় মাতাল লর‍াঁর সঙ্গে নিলর্জ্জ বসন্ত-চর্চা।

প্রত্যেকটি নতুন মিলনেই থাকত অসংযত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য। নিলর্জ্জতায় আর দুঃসাহসিকতাতেই যেন তরুণী নায়িকার যত আনন্দ। কোথাও বিন্দুমাত্র ভয় কি সংকোচের লেশ ছিল না তার। লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বেপরোয়ার মতই সে চাইত এই অভিসার লীলার সংঘটন। যত বিপদ আপদ সমস্ত তুচ্ছ করে সে এগিয়ে চলল এই পথে—দুঃসাহসিকতাতেই যেন তার গর্ব ! প্রেমিক এলে শুধু সে তার পিসীকে বলে যেত ওপরে বিশ্রাম করতে যাচ্ছে। তারপর যতক্ষণ প্রণয়ী থাকত ওপরে তার চলাফেরা কথাবার্তা—কোন কিছুরই লাগাম থাকত না। প্রথম প্রথম লর‍াঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠত তার এই দুঃসাহসে।

থেরেসার কানে কানে বলত, "কি করছ ? এত হট্টগোল করো না—মাদাম রাকুঁয়া উপরে উঠে এলে কি হবে ?"

"ধ্যেৎ" বলে হেসে উঠত থেরেসা !

"তুমি দেখছি কেঁপে-ঘেমেই অস্থির ! কাউণ্টারের পাশে এখন সে আটকে আছে—এখানে উঠে এলেই হল, চুরি হয়ে যাবে না সবকিছু তার ? আর উপরে এলেই বা কি ? তুমি লুকিয়ে পড়বে। থোড়াই কেয়ার করি তাকে—ভালবাসি তোমায়।"

এসব কথায় তেমন ভরসা পেত না লরাঁ। কামনার আগুনে মাতাল হলেও তার ভেতরকার হিসেবী কৃষকমন একেবারেই ঝিমিয়ে পড়েনি তখনো।

ক্রমে ক্রমে অবশ্য মাদাম রাকুঁয়ার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে—ক্যামিলাসের নিজের ঘরে প্রত্যক্ষ দিবালোকে পরস্ত্রী গমনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল সে। বারে বারে তার প্রণয়ী তাকে আশ্বাস দিয়েছে—বিপদে যারা ভয় করে না বিপদ তাদের কাছে ঘেঁষতেই সাহস পায় না। সেই কথাই ঠিক। এর চেয়ে নিরাপদ মিলনের স্থান কি হতে পারে প্রেমিক-যুগলের ? কেউ এঘরে তাদের খোঁজে আসবে না। এই নিরাপদ আশ্রয়ে তারা ঘটাত লালসা-বাসনার পরিসমাপ্তি।

ভাগ্নীর কি হল, অসুখ করল কিনা দেখবার জন্য সত্যি সত্যি মাদাম রাকুঁয়া উপরে উঠে এসেছিলেন একদিন। প্রায় তিন ঘণ্টা হল উপরে গেছে—মেয়ের আর নামবার নামই নাই যে। এত দুঃসাহস হয়েছে তার যে দরজা এঁটে দেওয়াও দরকার মনে করেনি। রান্নাঘর থেকে সোজা নজরে পড়ে তাদের ঘর।

বুড়ীর পায়ের থপ থপে আওয়াজ কানে আসতেই ভয়ে অধীর হয়ে উঠল লরাঁ; টুপি, ভেস্ট সব খুঁজতে লাগল আকুল হয়ে। তার মুখের ভাব দেখে থেরেসা হেসেই অস্থির। হাত ধরে টেনে এনে বসিয়ে দিল খাটের পায়ার কাছে। বলল:

"এখানে চুপচাপ বসে থাকো—নড়ো চড়ো না কিন্তু।"

তার উপর বিছিয়ে দিল ঘরের মধ্যের পুরুষের ব্যবহারের জামাকাপড় যা-ছিল তা। তারও ওপর ছড়িয়ে রাখল—নিজের সগুখোলা অন্তর্বাস পেটি কোটটি। সম্পূর্ণ অচঞ্চল নিখুঁত ভাবে দ্রুত সমাধা করল এত সব কাজ। তারপর পড়ল শুয়ে—কেশপাশ দিল এলিয়ে, বিস্রস্ত বসনা, অর্দ্ধ-নগ্ন তার দেহ—শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠানামায় কাঁপছে সারা দেহ।

মাদাম রাকুঁয়া আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে খাটের কাছে এলেন। মেয়েটি তখন ঘুমের ভাণ করে রয়েছে পড়ে। আর তার পেটিকোটের নীচে বসে ঘামছে লরাঁ।

"থেরেসা—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে লক্ষ্মীটি!"

থেরেসা চোখ খুলে হাই তুলে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, ভীষণ মাথা ধরেছে তার। পিসীকে বলল, একটু ঘুমোতে দিতে। বেচারা বুড়ী পিসী যেমন এসেছিল—তেমনি চলে গেল বাইরে।

আর নির্বাক হাসিতে ফেটে পড়ে হিংস্র উদগ্র চুম্বনে পরস্পরকে মাতাল করে তুলল প্রেমিক যুগল।

বিজয়-গর্বে থেরেসা বলল—"দেখলে ত, বলিনি আমাদের আর ভয়ের কিছু নেই! এরা সবাই অন্ধ! জন্মে প্রেমে পড়েনি ত!"

আবার কখনো অদ্ভুত খেয়াল হ'ত মেয়েটির! বিকারগ্রস্ত পাগল বলে মনে হত তাকে তখন।

ঘরের মধ্যে হুলো বেড়াল ফ্রাঁসোয়া ওঁত পেতে বসে প্রেমিকপ্রেমিকার প্রণয়লীলা লক্ষ্য করছিল একদৃষ্টে। তাদের কাণ্ড দেখে সেও যেন ডুবে গেছে আনন্দের অতলে।

তাকে দেখিয়ে লরাঁকে বলল থেরেসা, "ওটা যেভাবে দেখছে—তাতে মনে হয় আজ ক্যামিলাস বাড়ী ফিরলে ও সব কথা তাকে বলবেই বলবে। দোকানে বসে একদিন ও সব বেফাঁস করে দিলে কেমন মজা হয়? আমাদের দুজনের কত কথাই ত ওর জানা!"

ফ্রাঁসোয়া যদি কথা বলতে পারত এই কল্পনাতেই পাগল হয়ে উঠল মেয়েটি। কিন্তু তার দিকে তাকাতে গিয়ে লরাঁর মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের হিম শীতল রেশ এল নেমে।

"ও তাহলে কি করবে জানো", বলে চলল থেরেসা নিজের মনে, "আমার দিকে এক থাবা, আর তোমার দিকে অন্য থাবা বাড়িয়ে বলবে 'শোবার ঘরে এই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা দুজনে কি জোরে জোরে চুমু খায় একে অন্যকে। আমাকে কোন পাত্তাই দেয় না তারা। তাঁদের এই কাণ্ডকারখানা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। দোহাই আপনাদের এদের দুজনকে জেলে পুরে রাখুন। তাহলে একটু দুপুরে ঘুমিয়ে আরাম পাই'।"

শিশুর মত আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল থেরেসা। কাঁধ দুলিয়ে, হাত বেঁকিয়ে বেড়ালের মত অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল কিছুক্ষণ। পাথরের মত স্থির ফ্রাঁসোয়ার গোঁফের নীচে যেন খেলে গেল স্তিমিত হাসির রেখা।

লরাঁর হাত পা গেল ঠাণ্ডা হয়ে। কেমন বেখাপ্পা লাগল থেরেসার ঠাট্টা। উঠে গিয়ে বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এল ঘর থেকে। সত্যি সত্যি ভয় করছিল তার। তখনও প্রেমিকাকে পেয়ে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে ওঠেনি সে, এই তরুণীর প্রথম চুম্বনের জ্বালায় যে অসহ্য অস্বস্তির অনুভূতি হয়েছিল তার—সে স্মৃতির ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি সে তখনও।

আট

সন্ধ্যেবেলা দোকানে বসতে লর্ঁার বেশ ভালই লাগে। ক্যামিলাসের সঙ্গেই সে ফিরত অফিস থেকে। মাদাম রাকুঁয়াও তাকে ছেলের মতই ভালবাসতেন; তার দারিদ্র্যের কথাও তাঁর অজানা ছিল না। খাবার —পরবার—শোবার অসুবিধার কথা মনে করে তাকে রোজ নিজেদের সঙ্গে খেতে বলে দিয়েছিলেন। গ্রামদেশের লোক দেখলেই কথার ধুকড়ী বুড়ীদের যেমন খুব ভাব জমে ওঠে—লর্ঁার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

তরুণ যুবকটীও এ সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। অফিস থেকে বাড়ী ফেরবার আগে সে ক্যামিলাসের সঙ্গে একটু জেটি অঞ্চলে বেড়িয়ে আসত। এ ঘনিষ্ঠতায় তাদের কারুরই খারাপ লাগত না। গল্পে গল্পে একরকম ভালই কেটে যেত বেড়াবার সময় টুকু তার পরেই বাড়ী ফিরে শুরু হত মাদাম রাকুঁয়ার রান্নার বিচার। দোকানের দরজা এমন ভাবে খুলত লর্ঁা যে মনে হত সেই বুঝি বা মালিক। ঢুকেই চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে টান লাগাত আপন মনে—সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে !

থেরেসার উপস্থিতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হত না। বন্ধু বান্ধব পরিচিতের মতই ব্যবহার করত তার সঙ্গে। গল্প মস্করা, ঠাট্টা ইয়ার্কি সবই করত। এতটুকু পরিবর্তন হত না তার ভঙ্গীর। ক্যামিলাস ফেটে পড়ত অট্টহাস্যে। স্ত্রী শুধু হ্যাঁ, না করে লর্ঁাকে জবাব দিত বলে তার দৃঢ় ধারণা জন্মে যায়, তারা উভয়ে উভয়কে করে ঘৃণা। একদিন ত সে থাকতে না পেরে থেরেসার দুর্ব্যবহারের জন্য তাকে ধমকেই দিল একটু।

লরাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকই হয়েছে—সে একাধারে স্ত্রীর হয়েছে প্রণয়ী; স্বামীর বন্ধু ও মা'র আবদারে ছেলে। রাকুঁয়া পরিবারের বিলাস পরিবেশে সে ভাসিয়ে দিল নিজেকে। ক্যামিলাসের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় তার রাগ-দ্বেষ কি অনুশোচনা কিছুই প্রকাশ পেত না। নিজের বুদ্ধির ওপর এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে সে এখন আর তার ভাবভঙ্গীর দিকেও দৃকপাত করত না। নিজের সম্বন্ধে এত বেশী করে ভাববার জন্যেই তার ভুলের মাত্রা হত কম। তার প্রণয়িণী যতক্ষণ দোকানে আছে সে যেন সম্পূর্ণ অন্য জগতের মেয়ে। তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই লরাঁর। দোকানে বসে থাকার সময় যে সে প্রণয়িণীকে চুম্বনে চুম্বনে পাগল করে তুলত না—তার একমাত্র কারণ ছিল ধরা পড়ে যাবার ভয়। শুধু ভয়ই ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক—ক্যামিলাসের মনোবেদনা কি মা-এর দুঃখ কোন কিছুরই তোয়াক্কা ছিল না তার। অবৈধ প্রণয়ের খবর প্রকাশ পেলে যে কেলেঙ্কারী হবে সেটারও আবার তত ভাবনা ছিল না তার। তার ধারণা ছিল সে বেশ বুদ্ধিমানেরই মত একেবারে পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছে। যে কোন দরিদ্র, কামবুভুক্ষু যা করত—সেও তাই করেছে। এজন্যেই তার হিসেবী বুদ্ধিতে ভর করে প্রশান্ত নিরাপত্তায় বয়ে নিয়ে চলল আমুদে জীবনতরী।

তার চেয়ে ঢের বেশী উত্তেজিত থেরেসার পক্ষে এমন নির্লিপ্ত থাকা ছিল কঠিন। আবাল্য অনুসৃত কাপট্যের মুখোসে এখনও সে চরম অভিনয় করে গেল—পরম সার্থকতার সঙ্গে। বিগত পনের বছর ধরে সে নিজের সদ্য বিকশিত উচ্ছল কামনারাজির টুঁটি টিপে রেখেছিল; নিজেকে দেখিয়েছিল অবলা গোবেচারা গেঁয়ো মেয়ের মত। মৃত্যুর হিমশীতল মুখোস পরে মুখের ভাব লুকিয়ে রাখতে তার এতটুকু কষ্ট হল না। লরাঁ এলেই দেখত তার মুখ ভার, ঠোঁট কুঁচকে নাক ফুলিয়ে কেমন বিরক্ত বিরক্ত ভাব। দেখতেও যেমন বিশ্রী লাগত তাকে তখন—

তার সঙ্গে আলাপ জমানোও হত বিপদ। তবে হঠাৎ চোখে পড়বার মত একান্ত বিসদৃশ বাড়াবাড়ি করত না সে। ক্যামিলাস আর মাদাম রাকুঁয়াকে ফাঁকি দেওয়ার মধ্যে থেরেসা খুঁজে পেত নির্মম আনন্দ। লরাঁর মত কর্তব্য ভুলে ক্ষুধিত কামনা সমাপ্তির অবসাদে ডুবে থাকতে চাইত না সে। সে যে অন্যায় করছে এটা তার ভালভাবেই ছিল জানা। আবার মাঝে মাঝেই তার মনে হত লরাঁকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় মুখ ভরিয়ে দেবে। শাশুড়ী আর স্বামী দেখুক—তারও আছে প্রণয়ী, আকাট গেঁয়ো মেয়ে নয় সে মোটেই!

অনেক সময় আনন্দের জোয়ার প্লাবিত করত তাকে! তখন হাজার কুশলী শিল্পী হলেও সে চেপে রাখতে পারত না আনন্দ হিল্লোল। প্রণয়ী না থাকলে সে আনন্দের প্রকাশ হত সঙ্গীতের মূর্ছনায়। গুরুগম্ভীর ভাগ্নীর মনের এই সামান্য আনন্দ হিল্লোল ভালই লাগত মাদাম রাকুয়াঁর। টব ভর্ত্তি ফুলের ঝাড় কিনে তরুণ প্রেমিকা শোবার ঘরের জানালা ভরিয়ে ফেলল; নতুন কাগজে মুড়ে দিল সে ঘর আগাগোড়া; তারপর এল মেঝের কার্পেট—দরজার পর্দা—ঘরের সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্র। এসমস্ত বিলাসব্যসনের উপলক্ষ ছিল কিন্তু লরাঁ।

প্রকৃতি ও ঘটনাচক্রে এই তরুণী উৎসর্গীকৃত ছিল তরুণের জন্য—তাই যেন ঘটনাপ্রবাহ এনে মিলিয়ে দিয়েছে তাদের উভয়কে। একদিকে কপটাচারিণী, কামাতুরা রমণী অন্যদিকে পাশব-স্বভাব নারীমাংস-লোলুপ পুরুষ—এই উভয়ে ছিল উভয়ের ঠিক পরিপূরক। রাত্রে খাবার টেবিলে মুখোমুখী তাদের দেখলে—এ কথার সত্যতা বুঝতে দেরী হত না—লরাঁর স্মিতহাস্যময় মুখ—আর থেরেসার মুখ ও অতলস্পর্শী মুখোস!

সন্ধ্যেবেলাটা কাটত সকলের বেশ আনন্দে। নীরব নিথর স্বচ্ছ আঁধারের চাদরের পরিবেশে খাসা আড্ডা উঠত জমে। রাকুঁয়ারা

তিন জন আর লরাঁ বসত ।।ন হয়ে ; খাবার পরে দিনের হাজারো তুচ্ছ কথা, বিগত দিনের স্মৃতি আর অনাগত ভবিষ্যতের সোনালী আশার কাহিনী বলত সবাই মশগুল হয়ে। ক্যামিলাসের পক্ষে কাউকে ভালবাসা যতটা সম্ভব—সেই আড্ডার আত্মসন্তুষ্টিতে সে লরাঁকে ততটাই ভালবাসত। লরাঁও তার সমান প্রতিদান দিতে কার্পণ্য বোধ করত না। উভয়ের মধ্যেই চলত ঘনিষ্ঠ কথাবার্ত্তা, বিনিময় হত বন্ধুত্বের ভাবভঙ্গী আর দরদী দৃষ্টি। সন্তানদের ঘিরে সেই নির্বিরোধ পরিবেশে বর্ষিত হত মাদাম রাকুয়াঁর প্রশান্ত বাৎসল্য ধারা। দেখে মনে হত যেন কতদিনের পুরানো বন্ধুদের আড্ডা—সকলেই নিঃসংকোচে পরম নিশ্চিন্ততায় সাড়া দিচ্ছে অন্যের কথায়, বন্ধুত্বে চিড় খায়নি যেন কোথাও!

অন্যের মতই স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি থেরেসা তাদের হাস্যমুখর বুর্জোয়া স্ফূর্তিগুলো করত লক্ষ্য। অন্তরে অন্তরে সে ফেটে পড়ত অট্টহাসিতে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে করত তাদের ব্যঙ্গ—অথচ তার পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় ছিল না কারুর। উল্লাসে ফেটে পড়ত তার গুপ্ত প্রণয়লীলার কথা স্মরণ করে। কয়েক ঘণ্টা আগেই সে ছিল পাশের ঘরে। অর্দ্ধ উলঙ্গভাবে বিস্রস্ত বসনে আলুলায়িত কুন্তলে লরাঁর কোলে এলিয়ে দিয়েছিল নিজেকে। ক্ষণপূর্বের সেই বীভৎস শৃঙ্গারের খুঁটিনাটি কথা ভাবত আর মনে মনে তুলনা করত সেই জ্বলন্ত জীবনের সঙ্গে চোখের সামনের শ্মশানের নির্জীবতার! উঃ! কত সহজে সে এই সরল বিশ্বাসীদের দিচ্ছে ধাপ্পা—অথচ সেই সর্বজয়ী নির্লজ্জতার কি মাদকতাই না—তাকে পেয়ে বসেছে! এই ত কয়েক পা এগিয়ে ঐ সরু পার্টিশানের পাশে সে তার সর্ব্বস্ব দান করেছে পরপুরুষকে; অবৈধ প্রণয়ের পাগল-করা নেশায় হয়েছিল মাতাল! আর এখন যেন সেই প্রণয়ী চেনেই না তাকে! স্বামীর বন্ধুমাত্র, কে একজন রবাহুত—তার

দিকে নজর দেওয়াও বাহুল্য। এই বুটিল অভিনয়—জীবনের চরম ব্যঙ্গ—দিবসের উত্তপ্ত চুম্বনের দাবদাহের সঙ্গে সন্ধ্যার নির্লিপ্ততার মুখোশের কথা মনে পড়তেই তার তরুণ রক্তে বয়ে যায় নব নব কামনার উষ্ণ প্রবাহ।

দৈবাৎ মাদাম রাকুঁয়া কি ক্যামিলাস নীচে চলে গেলে থেরেসা লাফিয়ে উঠে নির্বাক চুম্বনের পাশবিক পেষণে পিষ্ট করত লরাঁর অধরোষ্ঠ। কামনার আবেগে দম বন্ধ হবার উপক্রম হত তার; হাঁফাতে থাকত সে। কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত সে আলিঙ্গনের ঘটত না বিরতি। তখন চোখের নিমেষে নিজের জায়গায় গিয়ে সে আবার হয়ে পড়ত গুরুগম্ভীর। লরাঁও নির্বিকার ভাবে ক্যামিলাসের সঙ্গে অসমাপ্ত কথার রেশ ধরে আলাপ সুরু করত। নির্মল আকাশে ক্ষণ-বিদ্যুতের ঝলকানির মতই ছিল তাদের তড়িৎ গতি লালসার উলঙ্গ প্রকাশ।

বিষ্যুতবারের সন্ধ্যেগুলো হত একটু বেশী সরগরম। এসব আড্ডার একঘেয়েমীতে লরাঁর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও, সে ভুলে কোনদিন গর-হাজির হত না এ আড্ডায়। নিজে সাবধান থাকবার জন্যেই সে চাইত আড্ডার সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে, ক্যামিলাসের বন্ধু-বান্ধবের প্রীতিভাজন হতে। গ্রীভে ও মিশ'র বক্তৃতা শুনতে হত এক মনে; মিশ'র মুখে লেগেছিল খুন আর রাহাজানীর একই কাহিনী আর গ্রীভের লেগেছিল আফিস, কেরাণী ও ওপরওয়ালার যত সব গালগল্প। তরুণটি তখন অলিভার ও সুজানের দিকে দিত নজর—এদের বোকামীটা তত বিরক্তিকর লাগত না তার। পাশা খেলায় সে সব সময়েই ছিল অগ্রণী।

বিষ্যুৎবারের মজলিসের গোছগাছের ভার ছিল থেরেসার উপর। মজলিস ভাঙার হট্টগোলে যখন মাদাম রাকুঁয়া আর ক্যামিলাস অতিথিদের এগিয়ে দিতে যেতেন পাসাজ-এর দোরগোড়ায়, তরুণী

লরাঁর কাছে সরে এসে হাত চেপে ধরে কানের কাছে ফিসফিসিয়ে করত প্রেমগুঞ্জন। কারুর নজর না পড়লে বাহবা দেখাবার জন্য চুমুও খেত তাকে।

বিদ্যুৎ শিহরণ আর সম্ভোগ সন্তুষ্টির যোগাযোগে কাটল একটানা আট মাস। আনন্দে বিভোর হয়ে রইল প্রেমিক যুগল। থেরেসার বিরক্তিকর জীবনের ঘটল অবসান—তার চাইবারও ছিল না কিছু; চর্বচোষ্য খেয়ে, মোটা কোঁদা হয়ে উঠল লরাঁ। পাছে কোনদিন এ আনন্দ জগৎ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়ে—এ আশংকা ছাড়া কোন ভাবনাও ছিল না তার।

নয়

একদিন বিকেলে তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে থেরেসার কাছে যাবার মুখে বড়বাবু লরাঁকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে আর ওভাবে ছুটি নেওয়া চলবে না। বহু ফাঁকি সে দিয়েছে আর একটি দিনের জন্য বেরিয়ে গেলেই কোম্পানী তাকে বরখাস্ত করা ঠিক করে ফেলেছে।

সারা বিকেল তাই সে গুম হয়ে বসে রইল চেয়ারে। রোজগার তাকে করতে হবেই; ছাঁটাই হলে চলবে না। সে-সন্ধ্যেয় থেরেসার ক্রুদ্ধ চোখ মুখের ভাবে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল দুঃখে। কথা খেলাপের কারণ যে কি করে প্রণয়িণীকে বোঝাবে ভেবে পেল না সে। ক্যামিলাস দোকানের দরজা বন্ধ করতে উঠলে সে চটপট থেরেসার কাছে সরে এসে নীচু গলায় বলল: "আর বোধ হয় আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে না। বড়বাবু আর ছেড়ে দেবেন না দুপুরে।"

ক্যামিলাস ফিরে এল। বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ না দিয়েই লরাঁকেও তাই উঠতে হল। সে স্পষ্ট ভাষণের রূঢ় আঘাতে টলতে লাগল

থেরেসার সারা শরীর। মরীয়া সে; কিছুতেই মানতে রাজী নয় যে তাদের মিলনের পথে কোনও অন্তরায় দৃষ্টি হতে পারে কোন দিন। ভবিষ্যৎ মিলনের ছক কাটতে কাটতেই সারারাত কেটে গেল। পরের বিষ্যুৎবারের দিনও সে মিনিট খানেকের বেশী কথা বলবার সুযোগ পায়নি লর্াঁর সঙ্গে। কি করে কোথায় যে দুজনে মিলে একটু পরামর্শ করবে তারই কোন জায়গা হাতের কাছে না পাওয়াতেই তাদের দুশ্চিন্তা গেল আরও বেড়ে।

গোপন মিলনের আর একটি দিন ঠিক করে তরুণী জানাল তার প্রণয়ীকে। কিন্তু সে দ্বিতীয় বারও পারল না সে কথা রাখতে। তখন থেকে একই চিন্তা তাকে পেয়ে বসল—কি করে তার দেখা পাবে নির্জনে।

দু' সপ্তাহ হয়ে গেল লরাঁ থেরেসার সঙ্গ সুখ থেকে বঞ্চিত। এখন বুঝতে পারছে তার জীবনে থেরেসা কতটা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যৌনক্ষুধা মেটাবার সুলভ অভ্যাসের বশে তার মনে জেগেছে নিত্যনতুন আনন্দ লিপ্সা। প্রণয়িণীকে দেখে তার আর অসোয়াস্তি লাগে না, ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত লালায়িত হয়ে উঠল সে থেরেসার সঙ্গ কামনায়! এতদিন ধমনীতে ধিকি ধিকি জ্বলেছে বাসনার শিখা; আজ প্রণয়িণীকে হারিয়ে অন্ধ আবেগে ফেটে পড়ছে সে বাসনা বহ্নি। পাগলের মত ভাল লাগছে তার প্রণয়িণীকে। দেহের চাহিদাই চিরকাল মিটিয়ে পাশবিক প্রকৃতিতে কোন কিছুই ভাববার অবকাশ সে পেত না; সহজাত প্রকৃতির তাড়নায় ছুটতো দিগ্বিদিকে। কোন রমণীর প্রেমে আকুল হয়ে সে যে নিজের অলস স্বভাব বদলে ফেলবে একথা একবছর আগেও কেউ ভাবতে পারত না তার সম্বন্ধে। কামনার সুপ্ত উৎস তার অজান্তেই ধীরে ধীরে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে তার চরিত্রে যে আজ তার হাত পা বেঁধে পরিণত করে দিয়েছে থেরেসার শৃঙ্গারের দাস।

ভয় হল হয়ত সব হিসেব নিকেশের পালা তার চুকে যাবে ; পাছে হঠাৎ বোকার মত কিছু ক'রে ফেলে এই ভয়ে পাসাজ দ্যু প্যাঁ নুতে খাওয়া ছেড়ে দিল সে। সে যেন আর তাতে ছিল না ; তার প্রণয়িণীর সুতীব্র লালসার প্রেরণা কখন যেন শিহরিত করেছে তার প্রতি স্নায়ুকেন্দ্রকে ! বাঁচতে হলে অন্ন বস্ত্রের মতই এই রমণীকেও তার চাই।

ডাকে থেরেসার চিঠিতে পরদিন বাড়ী থাকার খবর না পেলে হয়ত সেদিন সত্যি পাসাজ এ গিয়ে বোকার মত কিছু করে বসত। তার প্রণয়িণী জানিয়েছে সন্ধ্যে আটটায় আসছে তার কাছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে অবসাদের অজুহাতে সে ক্যামিলাসের কাছ থেকে ছাড়া পেল। খাবার পর থেরেসাও তার অংশটুকু ভাল ভাবেই অভিনয় করল। বলল ঃ একজন খদ্দের পয়সা না দিয়েই চলে গেছে ; তার কাছে তাকাদায় যাওয়া দরকার। খদ্দেরের বাসা হল বাতিগনলে অঞ্চলে, বেশ খানিকটা দূরে। এ ভাবে তাকাদা দিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে তা মনে করেন না মাদাম রাকুঁয়া কিংবা ক্যামিলাস। তবে থেরেসা যখন যেতে চাচ্ছে তারা আর তাকে বাধা দিল না।

তরুণী দ্রুতপদে চলে এল ওয়াইন পোর্ত-এ। পথে কতবার গেল গা পিছলে—ধাক্কা লাগল পথচারীর সঙ্গে। ঘামে ভরে গেল মুখ—হাতে ধরল জ্বালা। নেশায় মাতাল দেখাচ্ছে যেন তাকে। লরঁার থাকবার বাড়ীর সিঁড়িতেও এক ধাক্কায় উঠে এল উপরে। আটতলায় উঠবার মুখে যখন হাঁফ ধরেছে—সে দেখল উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে লরঁা করছে তার অপেক্ষা। চিলা কোঠায় উঠে এল সে। পাশ ফেরবার জায়গা নেই কোথাও এত ছোট ঘরটি। এক হাতে টুপিটা ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে শুয়ে পড়ল বিছানায়।....

উত্তপ্ত বিছানায় ঝরে পড়ছে স্কাইলাইট দিয়ে হিমেল পরশ। গুহার অতলে যেন আছে এই ভাবে প্রণয়ীযুগল বহুক্ষণ পড়ে রইল সেখানে।

হঠাৎ থেরেসার কানে এল কোন ঘড়িতে দশটা বাজল। উঃ, এর চেয়ে সে যদি কালা হত! বহুকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে সে চাইল চিলাকুঠির চারিদিকে। টুপি কুড়িয়ে নিল, আস্তে আস্তে রিবন বাঁধতে বাঁধতে বলল ঃ "এবার যাই।"

লরাঁ হাঁটু গেড়ে বসেছে তার পাশে। দু হাতের মুঠোয় ভরে নিল তার হাত।

"বিদায়।"

সে চেঁচিয়ে উঠল ঃ "না, না, বিদায় না, বড় অস্পষ্ট ও-কথাটা.... কখন আসবে আবার?" অপলক দৃষ্টির চাহনি লরাঁর চোখে।

"সত্যি বলব? বেশ। আর যে আসতে পারব তা মনে হয় না। কি অছিলা করব কিছু পাই না ভেবে!"

"তাহলে কি সত্যি বলতে হবে বিদায়?"

"না, নাগো তা যে চাই না বলতে।"

ক্ষুব্ধ যাতনা ভাষা পেল তার বিদায় বাণীতে। তারপর কি করছে, কি বলছে কিছু না ভেবেই আরও নরম স্বরে বলল,

"তবে আসি।"

লরাঁ কি যেন চিন্তা করছিল। সে ভাবছিল ক্যামিলাসের কথা অবশেষে বলল ঃ "না তার বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই আমার। তবু আমাদের পথের বিরাট অন্তরায় যে সে সেটাও ত সত্যি।....আচ্ছা ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ বাৎলাতে পারো না কিছু? কোথাও পাঠাতে পার না দূরে, বহু দূরে কোথাও?"

"দেশভ্রমণে"—মাথা দুলিয়ে তরুণী বলল ঃ "কি যে বল, তার মত লোক যাবে বেড়াতে?....তাদের জন্যে খোলা আছে একমাত্র মহা-প্রস্থানের পথ।....এদের হল কাছিমের প্রাণ সুতোয় করে ঝুলবে তবু মরবে না। আমাদের সবাইকে কবর দিয়ে তবে হবে ওদের ছুটি।"

নিস্তব্ধতা গ্রাস করল তাদের। হাঁটু ভেঙেই লঁরা সরে এল তার প্রণয়িনীর আরও কাছে। মাথা রাখল সেই বলাকাশুভ্র বক্ষপুটে।

"স্বপ্ন দেখছিলাম", সে বলল প্রেমার্দ্র গলায় "একটা সারা রাত তোমায় নিয়ে কাটাব ও তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোব, ভোরে ঘুম ভাঙবে তোমারই চুমুতে।....তোমার স্বামীর অধিকার চাই পেতে....বুঝলে?"

শিহরণ থেমে গেল লরঁার কথায়। ধরা গলায় উত্তর দিল থেরেসা "ঠিক, ঠিক।" বলে নীচু হয়ে চেপে ধরল লরঁার মাথা। অজস্র চুম্বনে ভরে দিল তার মুখ। এবড়ো খেবড়ো দাড়িতে ঘষা লাগল তার টুপীর। সে ভুলেই গিয়েছিল সেজেগুজে এসেছিল সেখানে, জামাকাপড়ের পাট নষ্ট হয়ে যাবে। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—শুধু কাঁদছে—আর সেই কান্নার মাঝে বলছে কত কি দুঃখের কথা!

"ওসব কথা বলো না?" বিগলিত থেরেসা বলল কোনও ক্রমে, "ও কথা শুনলে আর মনের জোর রাখতে পারি না—হয়ত থেকেই যাব তোমার কাছে চিরদিনের মত....এর চেয়ে মনে জোর দাও বরঞ্চ। বল আমাদের আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে....তুমি কি চাও না আমায়? না, একদিন না একদিন আমরা একসঙ্গে বাসা বাঁধব না?"

"তাহলে আবার কাল এসো" বলল লরঁা। তার হাত ছিল থেরেসার নিতম্ব বেষ্টন করে।

"কিন্তু বলেছি ত তোমায় আমি আনতে পারব না। কি অজুহাত দেখাব?" তারপর হাত কচলাতে কচলাতে সুরু করল ঃ

"দেখ, কেলেঙ্কারীর ভয় আমার নেই। যদি চাও-তো আজই ফিরে গিয়ে ক্যামিলাসকে বলতে পারি আমি তোমায় ভালবাসি—তোমার কাছে আসছি শুতে। আমার যত ভয় তোমাকে! তোমার জীবন যে ওলট-পালট করে দিচ্ছি—তা তো চাই না। আমি যে মরছি তোমায় কি করে সুখী করব তাই ভেবে!"

এতক্ষণে তরুণের সহজাত হিসেবী প্রকৃতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। উচ্ছ্বসিত গলায় সে বলল :

"ঠিকই বলেছ। ছেলেমানুষী করা উচিত হবে না আমাদের। যদি তোমার স্বামীর মৃত্যু হত........"

"যদি আমার স্বামীর মৃত্যু হত...." ধীরে ধীরে আউড়ে গেল কথা কটি থেরেসা।

"আমরা তাহলে বিয়ে করতে পারি; আর কাউকে থাকবে না ভয় করবার; জীবনে প্রথম আনন্দের স্বাদ পাব তখন। উঃ, কি মজার—কি মধুর হবে সে জীবন ?"

তরুণীর দেহ হয়ে উঠল ঋজু। কপোলদেশ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে, ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রণয়ীর দিকে—অধরোষ্ঠ কাঁপছে !

শেষে বিড়বিড় করে বলল, "মানুষ ত অনেক সময় মরেই। তবে বিপদ হয় যারা বেঁচে থাকে তাদের।"

লরা কোনও উত্তর দিল না। থেরেসা বলল : "যে কোন সহজ আর জানা উপায়ই হল খারাপ।"

শান্ত স্বরে লরা উত্তর দিল : "আমায় তুমি ভুল বুঝেছো। আমাকে অত বোকা পাওনি।....নিরালায় ডুবে থাকতে চাই তোমার প্রেমে।.... ভাবছি—কত দুর্ঘটনাই ত ঘটে জীবনে—পা ফস্কে যায়,....মাথায় টালি পড়ে খসে বুঝলে....তখন হাওয়াকে দোষ দেওয়া ছাড়া কি করবে ?" অস্বাভাবিক শোনাচ্ছিল তার গলার স্বর! একটু হেসে—মোলায়েম স্বরে আবার আরম্ভ করল :

"ঠিক আছে—কিছু ভেবো না তুমি। আমরা ঠিক এমনিই ভালবাসবো দুজনে দুজনকে—থাকবোও সুখে। দু-এক মাস যদি আমাদের দেখা নাও হয়—মন খারাপ করো না। ঠিক জেনো—আমি সেই সুখের দিনের ব্যবস্থা করছিএকমনে।"

যাবার জন্য থেরেসা দরজা খুলল। ব্যগ্র আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল তাকে লরাঁ। বলল:

"সত্যি বলছ তুমি আমার—একান্ত আমারই।" আবেগে অধীর কথা তার—"বল, বল, তুমি শুধু আমারই—যখন যেমন ভাবে চাইব তোমায় পাব—বল—বলতে হবে তোমায়।"

"হ্যাঁ"—অস্ফুট কান্না ঝরছে তার কথায়, "ওগো, আমি ত তোমারই, যা ইচ্ছে হয় করো আমায় নিয়ে।"

মুহূর্তমাত্র....তারা সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে—বিক্ষুব্ধ নিশ্চল। অকস্মাৎ প্রবল আকর্ষণে সে মুক্ত করে নিল নিজেকে। পেছনে না তাকিয়ে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে নীচে। তার অপস্রিয়মান পদধ্বনি আসতে লাগল লরাঁর কানে।

শেষ শব্দের রেশটি মিলিয়ে গেলে সে ফিরে এসে আশ্রয় নিল বিছানায়। চাদর তখনো গরম। থেরেসার প্রজ্জ্বলিত কামনা-বহ্নির উত্তাপ অনুভব করছে সে প্রতি রোমকূপে—আবেগে শ্বাস রোধ হয়ে আসছে তার। মনে হল এখনো নিশ্বাসে ভাসছে থেরেসার সৌরভ। এই ত এখানে ছিল সে—তীব্র সুগন্ধি আর ফুলের সুবাস ছড়িয়ে তাকে মাতাল করে তুলেছিল—দেহ মদিরায়। আর এখন সে কোথায়? প্রণয়িণীর প্রেতায়িত ছায়ার স্মৃতি শুধু দেবে তাকে সান্ত্বনা—ভাসবে তার চারিদিকে। অপরিতৃপ্ত কামনার আগুনে জ্বলছে সারা দেহ। জানালা বন্ধ করবার উৎসাহও পেল না সে। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল বিছানায়—ঠাণ্ডা করে নিতে চায় নিজেকে! দৃষ্টি চলে গেল স্কাই লাইটের ফাঁকে-দেখা চৌকো আকাশের দিকে!

ভোর না হওয়া পর্যন্ত একই চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে। থেরেসা আসবার আগে পর্যন্ত তার ক্যামিলাসকে হত্যা করার স্পৃহা জাগেনি মনে। তার মৃত্যুর উল্লেখ করেছিল শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে, আর

হয়ত প্রণয়িনীর দেখা পাবে না সেই দুঃখেই বলেছিল কথাটা। এইভাবে বাইরে প্রকাশিত হল তার অবচেতন মনের আর একটি দিক—পরস্ত্রীকে ভালবাসা থেকে তার মনে জাগছে খুনের নেশা। এখন উত্তেজনার অবসানে, নিশীথের গভীর প্রশান্তিতে সে ছক কাটলো খুনের। চুম্বন বিরতির স্মৃতির মুহূর্তে ভেসে উঠতে লাগল হত্যার ছবি। অনিদ্রার ঘোরে, থেরেসার সৌরভপ্লুত উত্তেজিত স্নায়ুর দাহনে লরাঁ আঁটতে লাগল—হত্যার পরিকল্পনা—বিচার করতে লাগল—সাফল্য-অসাফল্যের মাত্রা—হিসেব নিকেশ করে ফেলল হত্যায় তার কি কি হবে সুবিধে। সমস্ত কিছুই তাকে প্ররোচিত করতে লাগল এই অপরাধে। ভাবল—জেফোসের চাষী-বাবা যে কবে মরবে ঠিক নেই। আরও হয়ত বছর দশেক এই কেরাণী জীবনই কাটাতে হবে তাকে—পেট ভরাতে হবে সস্তা হোটেলে রেস্তোরাঁয়—নারীসঙ্গ থেকে থাকতে হবে বঞ্চিত, মাথা গুঁজতে আসতে হবে এই চিলে কোঠায়। এচিন্তায় আগুন জ্বলে উঠল তার মনে। আর ক্যামিলাস মরলে সে বিয়ে করবে থেরেসাকে, পাবে মাদাম রাকুয়াঁর সঞ্চিত অর্থ—অক্লেশে অনায়াসলব্ধ জীবিকায় কাটবে তার দিন। সেই অলস জীবনের আনন্দের মোহ পেয়ে বসল তাকে—শুধু খেয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে পিতার মৃত্যুর দিন গুণে। কিন্তু রূঢ় বাস্তব ভেঙে দিল তার সে সুখস্বপ্ন—ক্যামিলাসের অস্তিত্ব হল এ পথের প্রধান অন্তরায়। তাকে মারবার জন্য যেন আপনা থেকেই হাত হল মুষ্টিবদ্ধ।

লরাঁ চায় থেরেসাকে। হাতের কাছে একান্ত নিজস্ব করে পেতে চায় তাকে। স্বামীকে সরাতে না পারলে স্ত্রীও চলে যাবে নাগালের বাইরে। সে ত নিজেই বলে গেছে আসতে পারবে না। তারা হয়ত পালিয়ে যেতে পারে, উধাও শূন্যে, দূর দূরান্তরে বাঁধতে পারে নীড়—কিন্তু তাদের পেট চলবে কি করে? উপোস করেই মরতে হবে দুজনকে। না, স্বামীকে

খুন করলেই বিপদ তাদের কমছে, কোনও কেলেঙ্কারীর ভয় নেই; শুধু একজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গ্রহণ করবে তার স্থান। পাশবিক গ্রাম্য যুক্তিতে তার এটিকে মনে হল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিকল্পনা বলে। এমন কি তাঁর হিসেবী মনও সায় দিল এই সিদ্ধান্তে।

সে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল বিছানায়! উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘামতে লাগল; একটু আগেই থেরেসার দীঘল চুলের সুরভি মদির ছোঁয়াচ লেগে রয়েছে সে বালিশে। থেরেসার দেহ সুরভি তাকে পাগল করে তুলল। উত্তপ্ত শুকনো ঠোঁটের ফাঁকে চেপে পড়ে রইল বালিশের ওয়াড়—'দম বন্ধ হয়ে আসছে। বন্ধ চোখের সম্মুখে অনুভব করছে চলমান অগ্নি শিখা। একই প্রশ্ন উতলা করেছে তাকে—কি করে হত্যা করবে ক্যামিলাসকে, তারপর দম ফুরিয়ে এলে সে হঠাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল—মুখে লাগল জানালার কনকনে ঠাণ্ডার ঝাপটা। সে চৌকো আকাশের নীলাভ নিঃসীমতায় কাতর প্রার্থনা জানাল হত্যার সফল পরিকল্পনার জন্য। কোন উত্তরই পেল না সে। প্রণয়িণীকে যেমন বলেছে সত্যি সে তেমন গবেট নয়। বিষ কি ছোরার দরকার নেই তার। সে চায় গোপন হত্যা, নির্ঝঞ্ঝাটে, বিনা চিৎকারে, নির্ভয়ে কিংবা পৈশাচিকভাবে দম আটকে মারতে—সোজাসুজি গায়েব করে ফেলতে। প্রবৃত্তির তাড়না তাকে যতই উত্তেজিত করে তুলুক না—তার সমস্ত অস্তিত্ব সাবধান করে দিচ্ছে তাকে হিসেব করে এ পথে পা বাড়াতে।

ধীরে ধীরে সে ঢুলে পড়ল ঘুমে। শীতল বায়ুতে প্রেতায়িত থেরেসার উত্তপ্ত সুরভি গেছে মুছে। অবসন্ন, শ্রান্ত, লরাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল মধুর আবেশে। ঘুমিয়ে পড়ার সময় সে ঠিক করল উপযুক্ত সুযোগের জন্য করবে অপেক্ষা, তারপর তন্দ্রার ঘোরে বিড়বিড় করতে লাগল "তাকে মারবোই, মরতেই হবে তাকে।" কয়েক মিনিটের

মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হল সে—নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি হল সহজ সাবলীল।

থেরেসা বাড়ী পৌছল রাত এগারোটায়। মাথায় জ্বলছে আগুন, উদ্বেগে অধীর মন নিয়ে নিজেই জানে না কিভাবে কোন পথ দিয়ে সে পৌছল বাসায়। তখনো যেন সে লরাঁর সিঁড়ি ভেঙে নামছে—লরাঁর কথাই বাজছে তার কানে। এসে দেখল—মাদাম রাঁকুয়াঁ আর ক্যামিলাস আশংকায় চঞ্চল। দুটি একটি কথার উত্তর দিল তাদের—কোনই ফল হল না গিয়ে; আর পথে গাড়ীর জন্য দাঁড়াতে হয়েছে পুরো একটি ঘণ্টা।

বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে দেখল হিমশীতল তার শয্যা, উত্তপ্ত স্নায়ুমণ্ডল কুঁচকে উঠল ঘৃণায়। শুতে না শুতেই ক্যামিলাস পড়ল ঘুমিয়ে। বহুক্ষণ ধরে বালিশে ভর দেওয়া নিদ্রিত ক্যামিলাসের ক্লিষ্ট মুখের দিকে রইল চেয়ে। সরে না এসে পারল না তার কাছ থেকে। ইচ্ছে হল—প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় ক্যামিলাসের মুখটাকে।

দশ

প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল। রোজ সন্ধ্যেয় লরাঁ দোকানে বসে ভাবে। কেমন অবসন্ন লাগে তার—মনে হয় অসুখ করল বুঝি। চোখের কোলে পড়ল কালিমা, ঠোঁট দুটো হল রুক্ষ পাণ্ডুর। অথচ তার চালচলন ছিল তেমনি ভারিক্কী—ক্যামিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে তেমনি খোলামেলা বন্ধুতার ভাবের কোনই তারতম্য ঘটেনি। মাদাম রাকুঁয়া পরিবারের এই অতিথিটিকে আরও আদর করে রাখলেন সিক্তি; বিশেষ করে তাকে চাপা রোগীর মত যখন থেকে দেখতে লাগে।

থেরেসা পুনর্গ্রহণ করেছে সেই নিস্তব্ধ গভীর মুখোশ। আরও

নিশ্চল, আরও অনধিগম্যা, আরও প্রশান্ত দেখায় তাকে। মনেই হয় না লর‍্যার অস্তিত্ব আছে কিনা তার কাছে। কচিৎ কদাচিৎ সে তাকায় তার দিকে, কথা বলে আরও কম, ব্যবহার করে একান্ত নিস্পৃহের মত। মাদাম রাকুঁয়ার সদয় হৃদয় মথিত করে সমবেদনা ফুটে উঠত এই ব্যবহারে। তিনি কখনো তরুণটিকে বলতেন, "ভাগ্নীর নির্লিপ্ততায় কিছু মনে করো না। আমি ত ওকে জানি, বাইরেটাই ওর ওরকম ; মনটা কিন্তু দয়া-মায়ায় ভরা।"

প্রেমিক যুগলের আর মিলনের স্থযোগ ঘটেনি। স্যাঁ ভিক্তরের রাতটি ছাড়া তারা আর কেউ কাউকে নিরিবিলিতে পায় নি। সন্ধ্যেয় যখন মুখোমুখী হয়ে বসত তারা তখন তাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও আপাতদৃষ্টিতে প্রশান্ত দেখলেও মুখাবয়বের সেই অবিচল স্থৈর্যের নীচেই রয়ে যেত ভীতিবিহ্বলতা—আর কামনা বাসনার প্রচণ্ড ঝড়। থেরেসার অনুভূতিতে কখনো বাজত বিদ্রোহের মাদল, কখনো ভীতির শিহরণ—নয়ত উচ্ছল মাতলামীর নেশা। লর‍্যার বুকে উঠত আবিল পৈশাচিকতার তরঙ্গ, বেদনাহত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার দোলা। নিজেরাই তারা অন্তরের অতলে চাইতে পারত না ; খুঁটিয়ে বিচার করতে ভয় পেত সেই মন—অবশ করা জমাট কটু-বাষ্পোচ্ছ্বাসিত চাঞ্চল্যের উৎস।

দৈবাৎ কোন স্থযোগ পেলেই, দুয়োরের আড়ালে, কঠিন পেষণে পিষ্ট করতো একে অন্যের হাত। ইচ্ছে হত ছিঁড়ে আনে, কুঁড়ে আনে একে অন্যের অঙ্গ নিষ্ঠুর নখরাঘাতে। এখন আর তাদের ঐ সামান্য হস্তসংশ্লেষ ছাড়া কামোপশমের অন্য কোনও পথ নেই খোলা। দেহের সমস্ত কামযাতনা ঢেলে দিত তারা সেই হস্তসংশ্লেষে! কিন্তু কেউ উত্তর চাইতো না কারুর কাছ থেকে। অটুট ধৈর্যে অপেক্ষা করে রইল তারা।

এক বিষ্যুৎবারের সন্ধ্যেয় রাকুঁয়া পরিবারের অতিথিরা পাশা খেলার

আগে জমিয়ে গল্প করছিলেন। আড্ডার অন্যতম বিষয় ছিল প্রাক্তন পুলিশ সুপার মিশ'র কাছথেকে তাঁর নানা অতীত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনা ; জুয়োর্ড কি টম কাম্বের কাহিনী শোনার মতই গ্রীভে ও ক্যামিলাস—অখণ্ড আগ্রহে শুনতে লাগল মিশ'র রোমহর্ষক কাহিনীগুলি।

ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ছিল তারা। সে সন্ধ্যেয় মিশ সবে একটি ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শেষ করেছেন। শ্রোতাদের আতঙ্কের ঘোর তখনো কাটেনি। তিনি রেশ টেনে বললেন, "কিন্তু তাহলে কি হবে—সব খবরই প্রকাশ পায় না ; কত অপরাধইত থেকে যায় অপ্রকাশ। ন্যায়ের হাত থেকে কত অপরাধীই ত মুক্তি পায় স্বচ্ছন্দে।"

"কি বললেন ?" গ্রীভের মুখে বিস্ময়। "সত্যি বলছেন পৃথিবীতে এমন হত্যাকারীও আছে, যারা ধরা পড়েনি ?"

অলিভারের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠ্‌ল। কর্কশ কণ্ঠে সুরু করল : "শুনুন মশায়, তারা যে ধরা পড়ে না তার কারণ হল, কেউ জানেই না যে তারা খুন করেছে।"

এ যুক্তি গ্রীভের মনঃপূত হ'ল না। ক্যামিলাস তার সাহায্যে এগিয়ে এল! নির্বোধ আত্ম-প্রত্যয়ের স্বরে বলল, "আমিও শ্রীযুত গ্রীভের মত মানি। পুলিশের অকর্মণ্যতার কথা সহজেই বিশ্বাস হয় না, তাই মনে হয় না যে কখনো খুনীর গা ঘেঁষে চলতে হবে রাস্তায়।"

অলিভারের মনে হল ব্যক্তিগত আক্রোশের ছোঁয়াচ রয়েছে কথায়। বিরক্ত গলায় উত্তর দিল—"পুলিশ ত সত্যিই অকর্মণ্য নয়, তবে তাদের আর দোষ কি ? আমরা তা বলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি না। এক একজন খুনী যে কোথা থেকে সব কায়দা কানুন শেখে—ভগবানেরও সাধ্য নেই তাদের ধরে। কি বল বাবা—ঠিক না ?"

"ঠিকই ত" সম্মতি জানালেন মিশ'। "মাদাম রাকুঁয়া, আপনার

হয়ত মনে আছে, ভারনঁতে যখন আমরা ছিলাম, সদর রাস্তার উপরে একজন গাড়োয়ানকে'কে খুন করেছিল। পাশের নর্দমায় কুচিকুচি করে কাটা অবস্থায় পাওয়া যায় তার শরীর। সে খুনীর কোন হদিশই মেলে নি, হয়ত আজও সে বেঁচে আছে—হয়ত এখানের কাছেই থাকে—আর বাড়ী ফেরার পথে শ্রীযুক্ত গ্রীভের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

গ্রীভের মুখ চোখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। মুখ ফেরাতেও সাহসে কুলোচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই গাড়োয়ানের হত্যাকারী। অথচ এই আতঙ্ক শিহরণ মন্দও লাগছিল না তার।

আমতা আমতা করে বলল: না, না, তা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে আমিও একটা গল্প জানি। একজন ঝিকে মনিবের রূপোর বাসন-কোসন চুরির দায়ে জেল খাটানো হয়েছিল। ছুমাস পরে একটা গাছ কাটলে দেখা গেল তার ডগায় পাখীর বাসায় রয়েছে সেই কাঁটা-চামোচ সব। তখন ঝিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।....তাহলে দেখুন অপরাধীর শাস্তি হয়ই হয়।"

গ্রীভের বিজয়োল্লাস। অলিভারের মুখে উপেক্ষার হাসি। সে বলল: "তাহলে পাখীটাকেই বোধ হয় জেল খাটানো হল?"

নিজের ওপরওয়ালাকে ওভাবে হাস্যাস্পদ হতে দেখে রেগে উঠে ক্যামিলাস বলল: মোটেই তা নয়। শ্রীযুক্ত গ্রীভের কথার অর্থ তা নয়। মা পাশার ছক দাও ত........'

মাদাম রাকুঁয়া ছক বার করতে গেলে তরুণ আগের কথার খেই ধরে আরম্ভ করল, মিশ'র দিকে তাকিয়ে, "আপনি তাহলে বলতে চান পুলিশের কিছু করার নেই, তারা অসহায়?" খুনীরাও বুক ফুলিয়েই পথ চলে।"

পুলিশ সুপার উত্তর দিলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা সত্যি।"

"এ ত অন্যায়"—যোগ দিল গ্রীভে।

আলোচনার মুখে থেরেসা ও লরাঁ ছিল চুপ করে। গ্রীভের বোকামীতে তারা হাসেও নি। টেবিলে ভর দিয়ে তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল সে কাহিনী। মুহূর্তের জন্য তাদের চারজোড়া চোখ এক হয়েছিল—থেমে গিয়েছিল সে চোখের হঠাৎ আলোর ঝলকানি। থেরেসার চুলের গোড়ায় জমে উঠেছিল বিন্দু বিন্দু ঘাম, লরাঁর শরীরে আতঙ্কের হিম-শীতল কম্পন।

এগারো

কোনো কোনো রবিবারে আকাশ পরিষ্কার থাকলে থেরেসাকে নিয়ে ক্যামিলাস সাঁজ-এ-লিজে বেড়াতে বেরোত তরুণীর মন চাইছিল তার চেয়ে বরঞ্চ ঐ আঁধার দোকানেই থাকতে। স্বামীর হাত ধরে পথ চলায় এল ক্লান্তি আর পথপাশের দোকানের শো কেস দেখে কেবলার মত স্বামীর উচ্ছাস ও মত প্রকাশে ধরছিল বিরক্তি। কিন্তু ক্যামিলাস জোর করায় তাকে সায় দিতে হয়েছিল। ক্যামিলাসের ইচ্ছে বউকে নিয়ে একটু জাঁক করে! পথে কোনও সহকর্মী, বিশেষ করে কোনও উপরওয়ালার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গর্বে ফেটে পড়ত সে, মাদামের সঙ্গে বেরোচ্ছে বলে। তাছাড়া এমনি বেড়াবার জন্যেও সে বেড়াত। রবিবারের বেখাপ্পা পোশাকে গর্বিত পদক্ষেপে ছিল তার পথ পরিক্রমা। এমন লোকের সাহচর্য বরদাস্ত করবার মেয়ে নয় থেরেসা।

তারা যেদিন বেড়াতে বেরোত মাদাম রাকুঁয়া পাসাজ এর শেষ

পর্যন্ত এসে এগিয়ে দিতেন সন্তানদের। বিদায় নেবার সময় চুমু খেতেন কপালে যেন কত দূর দেশে যাচ্ছে তারা। তারপরে চলত তাঁর আশীর্বাদ, উপদেশ আর সাবধান বাণীর পালা।

যাই হোক। তিনি সাবধান করতেন তাদের। "কোন এ্যাকসিডেণ্ট করে বসো না....পারীতে কত গাড়ীঘোড়া....ভীড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ো না।" তারা চলে গেলে বহুদূর অনুসরণ করত ভীতি ব্যাকুল মা'র দুটি চোখ তাদের যাত্রাপথ।

কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রী যেত শহরের বাইরে।

দুজনে চলে যেত স্যাঁ উয়াঁ কিংবা আশনীয়েরে। সেখানে নদীর পাড়ে বসে পাশের রেস্তরাঁ থেকে ভাজা মাছ কিনে চিবোত। সেগুলো কি এমন তেমন দিন! প্রায় একমাস ধরে তা নিয়ে চলত জল্পনা কল্পনা। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত বাইরের খোলা হাওয়ায় থাকতে পেত বলে থেরেসার ভারী উৎসাহ ছিল এসব জায়গায় যেতে। স্যাঁ উয়াঁর নীলাভ সবুজ দীপাবলি তাকে মনে করিয়ে দিত ভারনঁর কথা। ছেলেবেলায় সীন নদীর জলকল্লোলে যে উচ্ছলতার নেশা জাগত তার মনে তারই সুখকর স্মৃতির আবেশ অনুভব করল নতুন করে। নদীর পাড়ে বসে হাত দিয়ে জল কাটতে কাটতে পেত এক নবীন জীবনের স্বাদ। সে যখন কাদা মাটিতে বসে কাপড়চোপড় নোংরা করে ফেলত ক্যামিলাস সযত্নে রুমাল বিছিয়ে খুব সাবধানে এসে বসত তার পাশে। ইদানীং তরুনটি প্রায়ই লরাঁকেও আনত সঙ্গী হিসেবে। তার সাহচর্যে মন্দ কাটত না অবকাশটুকু।

এক রবিবার ক্যামিলাস, থেরেসা আর লরাঁ দুপুরের খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়ল স্যাঁ উয়াঁর উদ্দেশ্যে। অনেক দিন থেকে জল্পনা কল্পনা চলছিল এ নিয়ে; এ বছরের মত এটাই হবে তাদের শেষ অভিযান। হেমন্তের গতায়ু বাতাসে শীতের হিমেল পরশ।

সেদিন সকালের আকাশও ছিল নীল গম্ভীর। মেঘলা রোদে যেমন, গরম ছায়াতেও তেমনি। সবাই ঠিক করল অপচীয়মান সূর্য কিরণের শেষ সুযোগ তারা ছাড়বে না কিছুতে। একটা গাড়ী ডেকে তিন জনে বেরিয়ে পড়ল। পেছনে পড়ে রইলেন গজগজ করতে করতে মাদাম রাকুঁয়া। পারী ছাড়িয়ে গড়ের কাছাকাছি গাড়ী ছেড়ে দিয়ে প্রশস্ত রাজপথ ধরে তারা হাঁটতে লাগল। তখন দুপুর বেলা। ধূলি-মলিন রাজপথ সেই প্রখর সূর্য কিরণে মনে হচ্ছে বরফের চাদরে ঢাকা। হাওয়াতেও গায়ে জ্বালা ধরে উঠে। স্বামীর হাত ধরে থেরেসা নিজের ছাতার আড়ালে চলছিল। আর ক্যামিলাস হাওয়া খাচ্ছিল বড় রুমালে। পেছনে আসছে লরাঁ; রোদে পুড়ে যাচ্ছে তার কাঁধটা—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। শিষ দিয়ে পথের ঢিল পাটকেল ঠোকর দিতে দিতে মনের আনন্দে সে চলছিল আর মাঝে মাঝে ক্ষুধিত দৃষ্টিতে দেখছিল শ্রোণীভারাবণতা প্রণয়িণীর মদালস গমনভঙ্গী।

স্যাঁ উয়াঁতে পৌঁছেই তারা খুঁজে নিল এক টুকরো সবুজ ঘাস-বিছানো মাঠ আর তাকে আড়াল করা ছোট কুঞ্জবন। বেড়াতে বেড়াতে চলে গেল তারা একটা দ্বীপে। সেখান থেকে আবার ঢুকল এক জঙ্গলে। পায়ের নীচে হচ্ছে অবিশ্রাম ঝরা-পাতার মস্‌মশানি। ঘন বিন্যস্ত গাছের কাণ্ডগুলো উপরে উঠে গেছে সোজা। নুয়ে পড়া শাখা প্রশাখা মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে যাত্রিকদের। দূরে দিগ্বলয় রেখা গেছে মিলিয়ে। চোখে পড়ছে শুধু বিবর্ণ তামাটে শুকনো পাতার রাশি গাছের শাখা প্রশাখায়, সাদা এ্যাসপেন আর ওক গাছের অস্পষ্ট আভাস। গভীর অরণ্য গ্রাস করেছে তাদের, ম্লান আশ্রয় জুটেছে সেই সংকীর্ণ পথে। নিথর নীরব চারিদিক। কানে বাজছে শুধু সীন নদীর নিরবচ্ছিন্ন কলতান।

একটা শুকনো জায়গা বেছে জামা-কাপড় সামলে নিয়ে ক্যামিলাস বসে পড়ল। চক্রাকারে পেটিকোট ঘুরিয়ে থেরেসা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই

মাটিতে। পোষাকের ভাঁজে অর্ধেক অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একটা হাঁটুর উপর অবধি উঠে এসেছে স্কার্ট সেই ঝাঁপাঝাঁপিতে। লরঁা উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে থুৎনীর ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখছে সেই নগ্নপদ-সৌন্দর্য আর কান রেখেছে ক্যামিলাসের কথায়। সে তখন সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছে—সীন নদীর চরগুলোকে কেন যে তারা ইংলণ্ডের বাগানের মত সাজিয়ে রাখে না—বসবার জন্যে বেঞ্চ পেতে, বালু ছড়িয়ে শুকনো খটখটে পায়ে চলার পথ তৈরী করে না, কোথায় সুন্দর সুন্দর গাছের ঝাড় ছেঁটে কেটে ছিমছাম করে ঠিক তুইলেরীর মত সাজিয়ে রাখবে তা না জবরজং করে গোলানো সব কিছু এখানে।

সেখানে তারা প্রায় তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিল। ইচ্ছা, সূর্যের খরতাপ একটু কমলে গ্রামের পথ ধরে বেড়িয়ে আসে। কিছুক্ষণ অফিসের আবোল তাবোল গল্প করে ঘুমিয়ে পড়ল ক্যামিলাস। মুখের উপর টেনে দিল টুপীটা। চোখ বন্ধ করে থেরেসা অনেক আগে থেকেই ঘুমের ভাণ করেছে।

লরঁা তখন নিঃশব্দ সঞ্চারে এগিয়ে এল তরুণীর দিকে। তার গোড়ালীর উপর এঁকে দিল চুম্বনের ছাপ। রোদে পোড়া জুতো-মোজায় মুখ জ্বলতে লাগল তার। মাটীর তীব্র সোঁদালো গন্ধ, থেরেসার গায়ের সুগন্ধ প্রসাধনী সব এক সঙ্গে মিলে সম্মোহিত করে ফেলল তাকে। রক্তে লাগল দোলা, স্নায়ুমণ্ডলে শিহরণ। নিগৃহীত সতীত্বে কাটাতে হয়েছে তাকে গত একটি মাস; স্যাঁ উয়াঁর সূর্যকরোজ্জ্বল পথে চলতে চলতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তীব্র যৌন বুভুক্ষা। আর এখন এই নিভৃত কুঞ্জে কামার্ত ছায়ার নিস্তব্ধ আস্তরণেও দয়িতকে বুকে পিষে মারবার সাধ্য নেই তার! অথচ এ রমণী ত একান্ত তারই অধিগম্য! না, হয়ত স্বামীর ঘুম ভেঙে যেতে পারে সামান্য হঠকারিতায়—এত দিনের সাবধানতার ফল সব তাহলে যাবে ভেস্তে। চিরকালের অলপ্যে

লোকটা! তরুণ প্রেমিককে অগত্যা থেরেসার অবিন্যস্ত পোষাকের আড়ালে শুয়ে পড়ে নির্বাক চুম্বন বর্ষণ করতে হল সেই সাদা মোজায়! থেরেসা পড়ে রয়েছে মরার মত, সামান্য হিল্লোল নেই তার শরীরে। লরাঁ ভাবল হয়ত সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শিরদাঁড়া কনকনিয়ে ওঠায় তাকেও উঠতে হল। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে! তখন তার নজরে পড়ল তরুণী মোটেই ঘুমোয় নি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে শূন্যে—মুখে ম্লানিমার ছায়া। চিন্তাকুল থেরেসা। অতলস্পর্শী গভীর অন্ধকার ছায়া—কিছুরই আভাস মিলবে না—সে চাহনিতে। নিঃসাড়ে পড়ে রইল সে, তাকালও না ফিরে লরাঁর দিকে।

লরাঁ সে নিথর চাহনিতে ভয় পেল। তার অজস্র আদরেও কেমন করে এমন নিশ্চল থাকতে পারল সে! সম্মুখে শায়িত প্রণয়িণীর স্কার্টে-ঘেরা দেহলতা দেখে একদিকে যেমন কামনার দাবদাহে পুড়ে যেতে লাগল তার সারা দেহ—তেমনি কোন এক অজ্ঞাত ভয়ও আচ্ছন্ন করে ফেলছে তাকে ধীরে ধীরে। অদম্য ইচ্ছে হল নীচু হয়ে চুমু খায় ঐ বিস্ফারিত চোখ দুটির উপর। কিন্তু তার স্কার্টের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে যে ক্যামিলাস। টুপি দিয়ে ঢাকা থাকলেও পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে তার হা-করা মুখ—কেমন বিশ্রী ভাবে কুঁচকে আছে যেন। নাক-ডাকাও শোনা যাচ্ছে ধীরে ধীরে ছোট্ট লালচে মোচের রেখা জুড়ে রয়েছে সারা থুতনী। মাথাটা পেছনে হেলে পড়ায় গলার নলি উঠানামা করছে প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। বীভৎস দেখাচ্ছে ক্যামিলাসকে।

তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজান্তেই হঠাৎ লঁরা তাকে লাথি মারবার জন্যে পা তুলল। ইচ্ছে হল গুঁড়িয়ে দেয় তাকে সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড পদাঘাতে।

অস্ফুট কান্না চেপে রইল থেরেসা। চোখ বন্ধ করে মুখ

রইল অন্যদিকে—ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তের স্পর্শ বাঁচাতে যেন সরিয়ে নিল সে নিজেকে।

কয়েক সেকেণ্ড ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল লরঁা ক্যামিলাসের ঘুমন্ত মুখের উপর পা তুলে। তারপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে চলে এল একটু দূরে। মনে মনে বলছিল সে তখন, নিতান্ত গবেট না হলে কেউ এমনভাবে কাউকে হত্যা করতে পারে না। ঐ থেঁৎলানো মাথার সন্ধানে হয়ত রাজ্যের পুলিশ ছুটত তার পেছনে। থেরেসাকে বিয়ে করে সুখে থাকা ছাড়া ক্যামিলাসকে মারবার অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না তার। মিশ'র গল্পের সেই গাড়োয়ান-খুনীর মত সেও হত্যার পর প্রকাশ্য দিবালোকে বুক ফুলিয়ে চলতে চায়।

সেখান থেকে কেমন আচ্ছন্নভাবে সে চলে গেল নদীর ধারে; দেখতে লাগল জলস্রোতের কলকলানি। তারপর হঠাৎ ফিরে এল কুঞ্জবনে। হ্যাঁ, একটা ফন্দী এঁটেছে সে ততক্ষণে। হত্যার এক খুব সহজ বুদ্ধি বার করেছে সে। বিপদের সম্ভাবনা নেই তাতে এতটুকু।

নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে সে জাগিয়ে তুলল নিদ্রিত ক্যামিলাসকে। হাঁচতে গিয়ে ক্যামিলাসের ঘুম ভেঙে গেল—সে ভাবল বেশ মজার ঠাট্টা ত ওটা। তারপর সে নাড়তে লাগল স্ত্রীকে। থেরেসা উঠে স্কার্ট গুছিয়ে নিলে তিনজনে আবার বেরিয়ে পড়ল সেই কুঞ্জবন থেকে।

সেই চর ছেড়ে তারা রাস্তা ধরে চলতে লাগল। পথে তখন ছুটির দিনের ভীড়। চোখ ধাঁধানো রঙের বহর উড়িয়ে মেয়েরা ঝোপে ঝাড়ে খেলা করছে, মাঝিমাল্লার দল হৈ হৈ করে নৌকা বেয়ে চলেছে, কেরানীরা স্বামী-স্ত্রী যুগলে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকটা রাস্তাতেই জনারণ্য। শুধু উচ্চাকাশে জলছে প্রশান্ত সূর্যের রশ্মি। দিগ্বলয়ে অস্তমুখী সেও, রক্তাভ বৃক্ষরাজির উপর দিয়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে সারা পথ যাবার আগের শেষ রক্তরাগে। শূন্যাকাশ থেকে নেমে আসছে তীক্ষ্ণদংশী শীতের পরশ।

ক্যামিলাস থেরেসার হাত ধরেনি ; সে কথা বলছিল লর্ঁার সঙ্গে। লর্ঁার ঠাট্টা তামাসা, লাফঝাঁপ—যতই দেখছিল—,ততই ভাল লাগছিল তার। পথের অন্যধারে এগিয়ে চলেছে তরুণী নতমস্তকে, মাঝে মাঝে ক্লান্তগতি—ঘাসের কুঁড়ি ছিঁড়ছে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের পেছনে পড়লে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল স্বামী ও প্রণয়ী দু'জনকে।

"এই, তোমার খিদে লাগেনি," অবশেষে ক্যামিলাস তার স্ত্রীকে ডেকে বলল।

"হ্যাঁ"—সে উত্তর দিল।

"এস তাহলে।"

থেরেসার ঠিক খিদে লাগেনি ; বেজায় অবসন্ন আর অসোয়াস্তি লাগছিল তার।

লর্ঁার ফন্দীসন্দি কিছুই সে জানে না, অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে তার পাদুটি।

তিনজনে নদীর পারে এসে রেস্তর্ঁার খোঁজ করতে লাগল। একটি সস্তা রেস্তর্ঁায় শেষে মিলল একটা ফাঁকা টেবিল কাঠের দোতালায়। আসে পাশে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তারই মধ্যে বসতে হল তাদের। হৈ হুল্লোড়, চীৎকার, বাসনের আওয়াজ। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় বেয়ারাদের পায়ের আওয়াজে কাঁপে সারা বাড়ীটা!

দোতালার বারান্দায় ততটা দুর্গন্ধ নেই। রেলিং-এ ভর দিয়ো থেরেসা নদীর পাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল একমনে। ডাইনে বাঁয়ে দুধারে খাবারের দোকান আর ফেরিওয়ালার ভীড় ; কুঞ্জের নীচে আবছা দেখা যায় খাবার টেবিলে বিছানো টেবিলক্লথ, পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকের জেল্লা। লোকজনের আনাগোণা, খালি মাথায় কেউ বা দৌড়াচ্ছে—আর কেউ হৈ চৈ করতে মাতোয়ারা, মাউথ হারমোনিয়ামে

কেউ বা গান বাজাতে পাগল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ভাজা পোড়ার সোঁদাল গন্ধের সঙ্গে রাশি রাশি ধূলো।

থেরেসার নীচেই লাতিনপাড়ার মেয়েরা হাত ধরাধরি করে ঘুরপাক খাচ্ছে। মাথার টুপীগুলো ঝুলে পড়েছে ঘাড়ের কাছে—তবু ঘুরপাক খাওয়া থামছে না তাদের। একেবারে ছোট্ট, বাচ্চাদের মত যেন খেলায় উন্মত্ত হয়েছে সব, মুহূর্তের জন্য যেন তারা ফিরে পেয়েছে কৈশোরের অমূল্য স্মৃতি। বহু-পরিচর্যায় দংশনক্ষত বিবর্ণ কপোলে কুমারীকালের রক্তিম লজ্জার আভাস। তাদের সেই বিশাল অপবিত্র চোখে সাময়িক মাধুর্যের মহিমা। ছাত্রের দল তাদের দিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে টানতে করছে কদর্য রসিকতা। আর দূরে সীন নদীর বুকে পাহাড়ের গায় জড়িয়ে আসছে প্রদোষের প্রশান্তি—আবছা নীল বাতাবরণে বিধৌত বৃক্ষচূড়ার মাথায় স্বচ্ছ কুয়াশার স্পর্শ।

"বাবা, বেয়ারা এবার একটু এদিকে এসো।" হাঁকলো লরাঁ—"আমাদের খাবার কি ব্যবস্থা হবে বলতে পারো ?" তারপর যেন আরও ভাল লাগবে ভেবে বলে উঠল, "আচ্ছা ক্যামিলাস, খাবার দিতে দিতে একটু নৌকোয় চড়ে জলে ঘুরে এলে কেমন হয় ? ওরা ততক্ষণ রোষ্ট-টোষ্ট গুলো ঠিক করুক না ?"

"যা বল", উদাসীন উত্তর এল ক্যামিলাসের। "তবে থেরেসার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।"

"না না, আমি দেরী করতে পারবো", বলল থেরেসা। লরাঁর ক্রুর দৃষ্টি তার চোখের উপর।

সবাই নীচে নেমে এল তারা। বেরোবার সময় একটি টেবিল রিজার্ভ করে খানার অর্ডার দিয়ে গেল। হোটেল ওয়ালার নিজেরই ডিঙী ছিল, তাকেই বলা হল একটা খুলে দিতে। বেছে বেছে লঁরা এমন সরু একটা ঠিক করল যে ক্যামিলাসের রীতিমত ভয় করতে লাগল চড়তে।

"হা ভগবান, জড়সড়ো হয়ে চুপচাপ না বসে থাকলে নাকানি-চোবানি খাওয়া কপালে আছে আজ সকলের।"

আদত কথা হল, কেরাণীটির ভীষণ ভয় করে জলকে। ভারনঁতে থাকবার সময় চিররুগ্ন বলে সীনের জলে ঝাঁপানি কাটতে পারেনি সে। স্কুলের বন্ধু-বান্ধবরা যখন মাতামাতি করেছে জল নিয়ে সে তখন দু'চারটা কম্বল চাপা দিয়ে কোঁকাত বিছানায়। লরঁা দুর্দান্ত সাঁতার শিখেছে; তেমনি একটানা বৈঠাও বাইতে পারে সে; আর শিশু ও মেয়েদের মত জলকে ভয় করা আর গেল না ক্যামিলাসের। গলুইএ পা-এর ভর দিয়ে একবার দেখে নিল কেমন মজবুত নৌকাটা।

"এসো, এসো চড়ে বস, তোমায় দেখছি ভয়ই ঘুচল না," ডাকলো লরঁা।

ক্যামিলাস ধীরে ধীরে সন্তর্পণে জলের কাছটায় গিয়ে বসল। পটাতনের কাঠে পা লাগলে তার সাহস এল ফিরে। সে আবার হাসি মস্করা করে দেখাতে চাইলো তার মোটেই ভয় করে নি।

থেরেসা তখনো গম্ভীর ভাবে পাড়েই দাঁড়িয়েছিল তার প্রণয়ীর পাশে। লরঁা টেনে ধরেছিল নৌকার কাছিটা। একটু নীচু হয়েই দ্রুত লয়ে বলে গেল ফিস ফিস করে,

"খেয়াল রেখো আজ ওকে নদীতে ডুবিয়ে মারবো। যা বলব শুধু তাই করো—আর সব দায়িত্ব আমার।"

চোখের নিমেষে সাংঘাতিক পাংশু হয়ে গেল তরুণীর মুখ—ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে সেখানে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

চাপা ফিস্ফিসানিতে লরঁা হুকুম করল, "নৌকায় ওঠো—উঠলে?"

সে তবু নড়ছে না। প্রচণ্ড সংঘাত শুরু হয়েছে তার অন্তরের অন্তস্থলে। মনে হচ্ছে বুঝি বা সে আত্মসম্বরণ করতে পারবে না। ফেটে

পড়বে কান্নায়। ক্যামিলাসের অট্টহাসি শোনা গেল "দেখ, দেখ, লরাঁ। থেরেসা ভয়েই মলো, ওরই লেগেছে ভয়। ওকি উঠবে না নৌকায় ?"

পাটাতনের উপর শুয়ে সে ততক্ষণে গলুই-এ হাত রেখে খুব নিশ্চিন্ত ভাব দেখাচ্ছিল সবাইকে। থেরেসার অদ্ভুত দৃষ্টি পড়ল তার দিকে একবার। ঐ ঠাট্টার তীব্র কশাঘাত পাগল করে তুলল তাকে। এক লাফে সে উঠে এল নৌকায়। সামনে রইল সে ; লরাঁ নিল বৈঠা। আস্তে আস্তে তীর থেকে দূরে চরের দিকে চলল নৌকা।

সন্ধ্যা। প্রায়ান্ধকার। বৃক্ষরাজির আনত ছায়া আচ্ছন্ন করেছে সবাইকে। নদীর দুই কূলের জল ঘন কাল। শুধু নদীর বুকে রূপোলি আলোর ঝিলিক। দেখতে দেখতে নৌকা এল মাঝ নদীতে। তীরের কলকোলাহলও এসেছে স্তিমিত হয়ে ; নাচ গান হৈ হল্লা সব হয়েছে অস্পষ্ট, কেমন করুণ যেন! সম্বরার গন্ধ আর ধূলো আসছে না তাদের নাকে। টাটকা হাওয়ার খেলা চলেছে তাদের ঘিরে, নেমেছে শীতের হিমেল আভাস।

লরাঁ বৈঠা বাওয়া বন্ধ করে নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিল।

দূরে চরের ধূসর রেখা পড়ছে নজরে। দিগ্বলয়ে গিয়ে মিশেছে দুটি তটরেখা। জল আর আকাশ যেন একই শ্বেত উপাদানে তৈরী। শরতের প্রশান্ত প্রদোষের মত করুণ মুহূর্ত বোধ হয় আর হয় না! শীতের বাতাসে সূর্যের আলো হয়ে পড়ে বিবর্ণ, বৃক্ষরাজি ছাড়ে পুরানো পাতা। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হবার পর শীতসমাগমে গ্রামাঞ্চলবাসীরা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে হতাশার করুণ ক্রন্দন। রাত নেমে আসে। চাদরে ঢেকে যায় ধরাতল।

তিনজনই নীরব। দূরের বৃক্ষরাশির শীর্ষ থেকে রোদের অপসৃয়মান শেষ ছায়াটুকুর দিকেই সকলের দৃষ্টি আবদ্ধ। তারা ক্রমে এসে পড়ছে চরের কাছে। অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে পড়ছে সেই ধূসর স্থলপিণ্ড জুড়ে।

সমগ্র প্রাকৃতিক দৃশ্যটি ধরা দিয়েছে প্রদোষের কায়াহীন রূপে। সিল্কের মত নরম কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে ঐ চর, আর দূরের পাহাড়ের চূড়া।

ক্যামিলাস এতক্ষণে উপুড় হয়ে শুয়ে নদীর মধ্যে মাথা বের করে দু হাতে জল নিয়ে খেলা করছিল।

"ওরে, বাবা, বেশ ঠাণ্ডা, মাথা ডুবিয়ে কাজ নেই আমার!" চেঁচিয়ে উঠল ক্যামিলাস।

লরাঁর মুখে কোন জবাব নেই। অসোয়াস্তির সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত সে লক্ষ্য করছিল নদীর দুই পারের দিকে। চাঞ্চল্যে অধীর হয়ে কামড়াচ্ছিল ঠোঁট আর হাত দুটো ঝোলাচ্ছিল হাঁটুর দুপাশে। থেরেসা নির্বাক, নিস্তব্ধ। কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করছে সেই চরম মুহূর্তের।

দুটো চরের মাঝে একটা শাখানদীতে গিয়ে ঢুকছে এবার নৌকা। একটা চরের পেছনে শোনা যাচ্ছিল—কয়েকজন মাঝি-মাল্লার গলা। অন্য দিকটা সব ফাঁকা।

লরাঁ তখন দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠেই জড়িয়ে ধরল ক্যামিলাসের কোমর। কেরাণী ত ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

"থাম, আর কাতুকুতু দিও না বলছি। থাম, পড়ে যাব যে নদীতে।"

লরাঁ আরও জোরে চেপে ধরে তাকে একটা ঠেলা দিল। ক্যামিলাস মুখ ফিরিয়েই বন্ধুর বীভৎস বিকৃত মুখের দিকে চাইল। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল। কায়াহীন ভীতি আচ্ছন্ন করল তাকে। চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চাইল সে। হঠাৎ রুক্ষ একটা হাত দারুণ পেষণে স্তব্ধ করে দিল তার সে প্রচেষ্টা। আত্মরক্ষার প্রবল তাড়নায় সেও লড়াই করল কিছুক্ষণ।

মুখ দিয়ে চাপা আকুল আওয়াজ বেরোচ্ছে তার, "থেরেসা, থেরেসা।" অচঞ্চল তরুণী দেখতে লাগল সেই দৃশ্য দু হাতে নৌকার বৈঠা ধরে ; আর

নদীতে দুলছে সেই নৌকা। চোখ বন্ধ করতে পারছিল না সে; কে যেন জোর করে খুলিয়ে রাখছিল তার চোখের পাতা। নির্বাক নিশ্চল থেরেসা!

"থেরেসা, থেরেসা" আবার ঝরে পড়ল আকাশ ছেঁড়া আকুতি। এ আহ্বান উপেক্ষা করার ক্ষমতা হল না তার। থেরেসা ভেঙে পড়ল কান্নায়, স্নায়ু মণ্ডল অবশ হয়ে এল। হিষ্টিরিয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নৌকার পাটাতনে। সেখানেই সে পড়ে রইল বিশ্রস্ত ভাবে মূর্ছায় আচ্ছন্ন নিশ্চল হয়ে।

এক হাতে গলা টিপে অন্য হাতে তখনো ক্যামিলাসকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে লরাঁ। অবশেষে খালি হাতখানার জোরে সে ছিনিয়ে নিল ক্যামিলাসকে নৌকা থেকে। ঘাড় কাত করে দুহাতে শূন্যে তুলে ধরল তাকে।

লরাঁর উন্মুক্ত কাঁধে মরণ কামড় দিল ক্যামিলাস। তখন লরাঁ এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দিল কেরানীটিকে নদীর অতলে—তার কামড়ের সঙ্গে উঠে গেল কাঁধের খানিকটা মাংসও।

বিকৃত চীৎকার করে ক্যামিলাস ডুবল। দু তিন বার তারপরেও সে ভেসে উঠেছিল উপরে—আর প্রত্যেকবারই কানে আসছিল তার কাতর গোঁঙানি।

লরাঁ মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে নৌকা দিল ডুবিয়ে। মূর্চ্ছিত প্রণয়িণীকে এক হাতে ধরে ঘাড়ের ওপর কলার চাপিয়ে দিয়ে সাঁতরাতে লাগল—আর সাহায্যের জন্য করুণ চিৎকারে আকাশ ফেলল ফাটিয়ে।

যে মাঝিমাল্লাদের গান শুনছিল তারা এতক্ষণ, তারা চলে এল এগিয়ে। সবাই দেখল এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—থেরেসাকে তুলে এক বেঞ্চির উপর তারা শুইয়ে দিল। বন্ধুর শোকে লরাঁর কান্না আর থামতে চাচ্ছিল না। বারে বারে জলে লাফিয়ে পড়ে যে সব

জায়গায় তাকে পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই এমন সব জায়গায় খুঁজতে লাগল সে। মাঝিমাল্লারা তাকে ধরে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল, সান্ত্বনা দিল বহু রকমে।

"আমারই দোষ", বলে কাঁদতে লাগল সে। "বেচারাকে অমন করে নাচতে দেওয়াই উচিৎ হয় নি আমার। নাচতে নাচতে একবার সবাই এক ধারে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গেল লোকটা ডুবে। ডোববার সময়ও সে বলে গেল তার স্ত্রীকে বাঁচাতে।"

তারপরই যথারীতি তুতিনজন মাঝিমাল্লাও প্রত্যক্ষদর্শী মিলে গেল।

"আমরাই ত দেখেছি। আপনাদের নৌকা ত আর নাচঘরের মেঝের মত নয়! দেখুন ত বেচারা বৌটার কি দশা হল।"

নিজেদের নৌকায় চড়ে তারা সেই ডোবা ডিঙীটাকেও টেনে তুলল। সেখান থেকে থেরেসা ও লরাঁকে নিয়ে গেল রেস্তরাঁতে। তাদের তখন খাবার তৈরী। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্যাঁ উয়াঁময় রাষ্ট্র হয়ে গেল ঐ তুর্ঘটনার কথা। মাঝিমাল্লারা প্রত্যক্ষদর্শীর মত সব ঘটনা বর্ণনা করে গেল! রেস্তরাঁর বাইরে একদল দরদীর ভিড় উঠল জমে।

দয়ার্দ্র হৃদয় হোটেল মালিক নিজেদের বাক্স থেকে বের করে তাদের জামাকাপড় পরতে দিলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর থেরেসার আকুল কান্নায় ব্যাকুল হয়ে পড়ল সবাই। তাকে তখন শুইয়ে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। যে ক্রূর ঘটনার যবনিকা পাত হল এই মাত্র, প্রকৃতিদেবী তার উপরও আস্তে আস্তে দয়ালু স্পর্শ দিলেন বুলিয়ে।

তরুণীটি অপেক্ষাকৃত শান্ত হলে হোটেলওয়ালার তত্ত্বাবধানে তাকে রেখে দিল লরাঁ। সে চাইল একাই গিয়ে পারীতে এই তুর্ঘটনার খবর জানায় সবাইকে। সত্যি বলতে কি, তার ভয় হচ্ছিল থেরেসার হাবভাবে। তাকে কিছুক্ষণ নিজে নিজেই সব ভাববার অবকাশ দিতে চাইল সে।

মাঝিমাল্লারা খেল ক্যামিলাসের রাতের খাবারটা।

বারো

বাসের ঘনান্ধকার কোণায় বসে 'লর'া শেষ ছোঁয়াচ বুলাল তার পরিকল্পনায়। তার দৃঢ় ধারণা হল ন্যায়ের হাত সে এড়াবেই। অপরাধের কৃতকার্যতায় প্রচণ্ড আনন্দও হল মনে। ক্লিশি গেটে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে সে গিয়ে উঠ্‌ল বুড়ো মিশ'র বাড়ী। রাত তখন নটা বেজেছে।

গিয়ে দেখল বুড়ো আর ছেলে-বৌ একটা টেবিলে বসে আছে। এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তার দুঃসময়ের ত্রাতা খুঁজে বের করা—আর মাদাম রাকুয়াকে এই খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা। নিজের যেতে সাহস হচ্ছিল না। ভয় হচ্ছিল হয়ত মাদামের কান্নাকাটি দেখে সে তত ভালভাবে অশ্রুসজল অভিনয় করতে পারবে না। তাছাড়া—তাঁর কথা ভেবে যে একটু দুঃখও না হচ্ছিল লর'ার মনে তা নয়। তবে অন্তরের অতলে সে খুব বেশী দুশ্চিন্তা করত না সেজন্য।

তাকে হঠাৎ ঐ রকম উস্কোখুস্কো ঝড়ো কাকের মত ঘরে ঢুকতে দেখে মিশ' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন তার মুখের দিকে। ভাঙা-ভাঙা গলায়—যেন দুঃখে যাতনায় ফেটে পড়ছে সে—লর'া বলে গেল দুর্ঘটনার আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

"দু'জন গভীর শোকাচ্ছন্ন মহিলাকে যে কি করে কি বোঝাব কিছু ঠিক করতে না পেরে ছুটে এসেছি আপনার কাছে।........মার কাছে কিছুতেই আমি একা একা যেতে পারছি না—আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।"

সে যতক্ষণ কথা বলে চলেছিল অলিভারের অচঞ্চল দৃষ্টি ছিল তার মুখের উপর। সে দৃষ্টির সম্মুখে ভীত হয়ে পড়ল সে। এক দুঃসাহসিক

ঝুঁকি নিয়ে খুনী এসে সোজাসুজি পুলিশের দরবারে দেখা দিয়েছে। এটাই তার বাঁচবার প্রথম ব্যবস্থা। তবু তাদের সেই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে মনে মনে না কেঁপে পারেনি সে। করুণা ও আকস্মিকতার প্রতিমূর্তি সেই চাহনিকে ভুল করে ভাবল—সন্দেহের ছায়া। সুজান ত প্রায় মূর্ছা যাবার উপক্রম হল এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায়। মৃত্যুভয়ে ভীত হলেও অলিভিয়ের ধীর স্থির চিত্তে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী শুনে প্রতি পদে চমকে উঠেছিল। লরাঁর মুখের দিকে যে অমন করে তাকিয়ে ছিল—সে তার স্বভাব বলে। নিষ্ঠুর সত্যের সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না তার। বুড়ো 'মিশ' ভয়ে, বিস্ময়ে—শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ছিলেন সে কাহিনী শুনতে শুনতে। চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন ঃ

"হা ভগবান! কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলত! বেড়াতে বেরিয়ে—অমন করে মরা—একেবারে আচমকা, কী ভয়ংকর........বেচারা বুড়ী মাকে কি করে সান্ত্বনা দেব—ভালই করেছ আমাদের কাছে এসে। আমরা সবাই মিলে যাব তাঁর কাছে।"

লরাঁকে সমস্ত ঘটনা আবার নতুন করে বলতে বলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরী হলেন।

চারজনই একসঙ্গে নেমে গেলেন সিঁড়িতে। পাসাজ দু পঁ ন্যু'র মুখে এসে মিশ' লরাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ঃ

"তুমি ভেতরে এস না। তুমি এলে বড় করুণ, মর্মান্তিক সাক্ষী হবে ব্যাপারটার। ওঁর মনে মনে আগে থেকেই সন্দেহ হবে—তখন জোর করে আমাদের কাছ থেকে কথা আদায় করতে চাইবেন তিনি।.... এখানে দাঁড়াও আমরা না ডাকা পর্যন্ত।"

এ ব্যবহারে হত্যাকারী হল আশ্বস্ত। দোকানে ঢোকার চিন্তায় তার কাঁপুনী লেগেছিল হাড়ে হাড়ে। নিশ্চিন্ত হয়ে সে পথে চলাফেরা

করতে লাগল। মাঝে মাঝে সে ভুলেই যাচ্ছিল—কি হয়েছে—এতক্ষণ। দোকানে দোকানে দেখছিল লোকের ভীড়। এমনি করে প্রায় আধঘণ্টার উপর গেল কেটে—উত্তরোত্তর মনের জোরও ফিরে পেল সে।

সকাল থেকে তার পেটে কিছু পড়েনি; এখন হঠাৎ খিদে লাগল তার। একটা পেষ্ট্রির দোকানে ঢুকে গণ্ডেপিণ্ডে কেক পেটে পুরে নিল সে।

পাসাজ-এর দোকানে ইতিমধ্যে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণ হয়েছে। মিশ'র শত চেষ্টা সত্ত্বেও মাদাম কথাবার্তার ফাঁকে একবার বুঝতে পারলেন যে ছেলের যেন কি দুর্ঘটনা হয়েছে! দুঃখে, বেদনায়, হতাশায় আকুল হয়ে তিনি বাধ্য করলেন বন্ধুদের সত্য কথা বলতে। ঘটনার কথা শুনে তাঁর যে অবস্থা হল তা বর্ণনার অতীত। স্তিমিত ফোঁপালীতে ফুলে ফুলে উঠছেন তিনি, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে সারা দেহ, দুঃখে, ভয়ে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল তাঁর। দুজনে তাঁকে পাঁজাকোলা করে ধরে না রাখলে হয়ত তিনি মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি দিয়েই কাঁদতেন। হাঁটু গেড়ে নিজে কাঁদতে কাঁদতে দুজনে ধরে ছিল শোকাকুল বৃদ্ধাকে। অলিভিয়ের ও মিশ' ছিলেন দাঁড়িয়ে! এই শোকের দৃশ্যে তাঁদের স্থৈর্যের বাঁধ গেছে ভেঙে। বিচলিত ভাবে ইতস্ততঃ তাকালেন তাঁরা।

ভাগ্য মা'র চোখের সামনে ভেসে উঠল সীনের বুকে ডুবন্ত ছেলের বাঁচবার জন্যে শেষ প্রচেষ্টার ছবি! শক্ত হয়ে গেছে, ফুলে উঠেছে সে দেহ—আর তারই পাশাপাশি জেগে উঠল শৈশবের দৃশ্য! একহাতে মৃত্যুকে ঠেকাচ্ছেন তিনি। অন্তত দশবার তিনি বাঁচিয়ে তুলেছেন তাকে; স্নেহের সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন তার উপর তিরিশটি বছর ধরে। আর এখন সে কোথায়? সীনের নোংরা হিমশীতল জলের অতলে কে ছিনিয়ে নিল তাকে? মনে পড়ল গরম কম্বলের কথা—

যেটা দিয়ে তিনি জড়িয়ে রাখবেন শিশু সন্তানকে। কত আদর, কত যত্ন, কত সেবা করেছেন তার, সে সব কি শুধু এই দিনটির জন্যে? কথাগুলো মনে হতেই তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল—কে যেন দম আটকে মারতে আসছে তাঁকে।

বুড়ো মিশ'র ফেরবার তাড়া ছিল। তিনি মাদাম রাকুঁয়ার কাছে সুজানকে রেখে অলিভিয়েরকে সঙ্গে করে লরাঁকে নিয়ে স্যা উয়াঁর দিকে রওনা হলেন।

পথে একরকম কেউ কোন কথাই বলেন নি। গাড়ীর নিবিড়তম অন্ধকারে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসেছিলেন সবাই। মাঝে মাঝে পথের পাশের গ্যাস লাইটের ক্ষণ-চকিত আলোর ছটা লাগছিল তাঁদের মুখে। যে মর্ম্মান্তিক ঘটনার দৌলতে তাঁরা সবাই একত্র হয়েছেন—তার ছায়ার ম্লান মৌন প্রভাব আচ্ছন্ন করেছে সবাইকে।

নদীর পাড়ের রেস্তরাঁয় পৌছে তাঁরা থেরেসাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখলেন। তার চোখে মুখে আগুনের হল্কা; হোটেলের মালিক এদের কাণে কাণে বললেন—তরুণীর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! কিন্তু ব্যাপার হল এই যে, থেরেসার মনের জোর বলতে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তার ভীষণ ভয় হল, হয়ত বিকারের ঘোরে এই হত্যাকাণ্ডের কথা মুখ থেকে বেফাঁস বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই সে অসুস্থতার ভাণ করে পড়ে রইল মড়ার মতন। দাঁতকপাটি মেরে, চোখ বুঁজে পড়ে রইল সে। চাদরে মুখ পর্যন্ত ঢেকে, বালিশে মাথা গুঁজে চুপটি করে পড়ে রইল—শুধু শুনতে লাগল একান্ত ব্যস্ততায় চারিদিকের আলাপ-আলোচনা। তার বন্ধ চোখের সামনে থেকে-থেকেই ভেসে উঠতে লাগল নৌকায় ক্যামিলাস আর লরাঁর জড়াজড়ির দৃশ্য। সেই ঘোলা জলে নাকানি চোবানি খাচ্ছে তার স্বামী—কি ফ্যাকাশে

দেখাচ্ছে তাকে—কী বীভৎস—কী জীবন্ত সে ছবি। ওই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের কথা মনে হতেই তার জ্বরও গেল বেড়ে।

বুড়ো মিশ' তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলেন। একটু সান্ত্বনা দিতে চাইলেন তাকে। উত্তরে একটা অস্থির দেহভঙ্গী করেই সে আবার ভেঙে পড়ল কান্নায়।

তখন রেস্তরাঁর মালিক বললেন, "ওঁকে একা একাই থাকতে দিন। দেখছেন না—কেমন সামান্য আওয়াজেই চমকে উঠছেন একেবারে....।"

নীচে একজন পুলিশের লোক দুর্ঘটনার সব খবরাখবর টুকে নিচ্ছিল। মিশ' আর তাঁর ছেলে দুজনে নেমে গেলেন। তাঁদের পেছনেই এল লরাঁ। অলিভিয়ের নিজের পুলিশী পদমর্যাদার কথা প্রকাশ করায় সমস্ত ব্যাপারটা মিনিট দশেকের মধ্যেই চুকে গেল। মাঝি মাল্লারা তখনো সবাই সেখানে জটলা করছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষদর্শী বলে নিজেকে জাহির করে রোমহর্ষক বর্ণনা দিচ্ছিল সেই দুর্ঘটনার। অলিভিয়ের কি তার বাবার মনে সামান্যতম সন্দেহের ছায়াপাত হয়ে থাকলেও এদের কথার পর আর তার লেশ মাত্র অবশিষ্ট রইল না। তবে তাঁরা লরাঁর কথায় অবিশ্বাসই করেন নি কখনো। বরঞ্চ পুলিশের লোকের কাছে তাকেই পরিচয় করে দেন নিহতের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে। তাছাড়াও স্পষ্ট করে লিখিয়ে নিলেন যে ক্যামিলাসকে বাঁচাবার জন্য সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিজের জীবন বিপন্ন করে। পর দিনের সংবাদপত্রে এই দুর্ঘটনার কথা ফলাও করে ছাপা হল। হতভাগ্য মা, অবর্ণনীয় শোকবিধুর বিধবা স্ত্রী, মহান বন্ধু, সকলেরই কথা ছিল তাতে।

সরকারী রিপোর্ট লেখা শেষ হয়ে গেলে লরাঁর মনে নতুন বলের সঞ্চার হল। যে মুহূর্তে তার হত্যার বলি মরণ কামড় দিয়েছিল তার কাঁধে—তখন থেকে তার ধড়ে আর প্রাণের লেশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

যন্ত্রের মত সে সব কাজকর্ম করে যাচ্ছিল একটি বহু-পূর্বের আঁকা ছক ধরে। আত্মরক্ষার নিবিড় প্রচেষ্টাই জুটিয়েছে, তার মুখে ভাষা, পরিচালিত করেছে তার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী। এখন ধরা পড়বার ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় আবার তার ধমনীতে নতুন ছন্দে বইছে শোণিত ধারা। পুলিশ তার অপরাধের বিষয়ে অনুসন্ধান করেও তার বিরুদ্ধে কিছুই পায় নি। পুলিশের চোখে সে ধূলো দিয়েছে। তারা বেকসুর খালাস করে দিয়েছে তাকে। সে রক্ষা পেয়েছে। এই সুখচিন্তায় সারা গা-থেকে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল তার ; মনে ও দেহে ফিরে এল বল। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে আরও ভাল করে দুঃখিত বন্ধুর অভিনয় করে যেতে লাগল। অন্তরের অতলে হচ্ছিল তার সুখ-শিহরণ—মনে পড়ল থেরেসার কথা। সে ওপর তলায় শুয়ে আছে বিছানায়।

মিশ'কে ডেকে সে বলল, "ও বেচারাকে ত এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে না এখানে। যেমন করেই হোক ওকে নিয়ে পারী যেতেই হবে আমাদের। আমার সঙ্গে আসুন, সকলে মিলে ওকে বুঝিয়ে বলি।"

উপরে উঠে এসে সে নিজেই থেরেসাকে উঠে আসতে বলল। উঠল থেরেসা। তাকাল বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে—সে তখন কাঁপছে—শুধু কাঁপছে। অনেক কষ্টে উঠে বসল সে। পুরুষরা সবাই তখন বাইরে চলে গেলেন। মালিকের স্ত্রী রইলেন শুধু তার সঙ্গে। তারপর পোশাক পরে টলতে টলতে সে নেমে এল অলিভিয়ের-এর হাতে ভর দিয়ে।

পথে নিস্তব্ধ ছিলেন সবাই। অদম্য সাহসিকতায় ও চরম নির্লজ্জতার সঙ্গে অন্যের অলক্ষ্যে স্কার্টের আড়ালে লরাঁ চেপে ধরল থেরেসার হাত নিজের উত্তপ্ত মুঠোয়। প্রায়ান্ধকারের গাড়ীতে থেরেসার মুখোমুখী বসেছিল সে। বুকের ওপর তার মুখটা ঝুঁকে পড়ায়—লরাঁ সে মুখ দেখতে পাচ্ছিল না ভাল করে। তবে তার ভীত পাণ্ডুর হাত নিজের

মুঠোয় টেনে নিয়ে সে চেপে রইল সারা মাজারিন এর পথটুকু। থেরেসার কাঁপন লাগছে তার হাতে—তবে সে হাত সরিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। তাদের হাতের মুঠো জ্বলছে তখন কামনার আগুনে। উভয়ের ধমনীর শোণিতধারা যেন বয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন উদ্দামতায়। অন্ধকার পরিবেশের মর্মস্পর্শী নীরবতার মধ্যে তাদের সেই কঠিন হস্তসংশ্লেষ যেন ডুবন্ত ক্যামিলাসের মাথায় ডাঙস মারছে।

গাড়ী থামলে মিশ' ও তাঁর ছেলে প্রথমে নামল। লরাঁ তার প্রণয়িণীর দিকে একটু ঝুঁকে অনুচ্চকণ্ঠে বলল: "ভয় পেও না, থেরেসা। এখনও অনেককাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে—মনে থাকে যেন।"

তরুণী এতক্ষণ কোন কথাই বলে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম তার ঠোঁট দুটি ঈষৎ সঞ্চালিত হল। সে বলল: "মনে থাকবে"। কাঁপছে তার সারা দেহ—গলার স্বরের রেশ যেন মিশে যাচ্ছে বাতাসের দোলায়।

অলিভিয়ের হাত বাড়িয়ে দিল তাকে নামাতে এবার লরাঁ ঢুকল দোকানে। মাদাম রাকুঁয়াকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রলাপ বকছেন। থেরেসাও গিয়ে কোনও ক্রমে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মার কাছ থেকে সরে এসে তার কাপড় ছাড়বার ব্যবস্থা করবারও ফুরসুৎ' পেল না সুজান। ঘটনাবলীর সমস্ত তারই আঁকা ছকে চলতে দেখে এবার লরাঁ নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। ধীর পদক্ষেপে সে চলল রু স্যাঁ ভিক্তরএ তার চিলে কোঠায়।

ততক্ষণ মাঝ রাত্রি কেটে গেছে। জনমানবহীন পথে হাওয়ার একটানা দীর্ঘশ্বাস। নিজেরই পদশব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ কানে ঢুকছে না তরুণ পথিকের। নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতার আঁধারের পরশে এল মাদকের মত ক্ষণ-চকিত কামনার বহ্নি জ্বালা। সে চলল এগিয়ে।

অবশেষে—সংঘটিত হয়েছে অপরাধটি। ক্যামিলাসকে সে হত্যা

করেছে। এখন সব শেষ। আর এ নিয়ে কোন কথা উঠবে না। এবার তার জীবনে আসবে শান্তি। সে অপেক্ষা করবে শুধু থেরেসার পাণি-পীড়নের। এতদিন হত্যার ছবি মনে ভেসে উঠলেই তার কেমন দম আটকে আসত। আজ নির্ঝঞ্ঝাটে সে পর্ব সমাধা হওয়ায় তার মন থেকে জগদ্দল পাথরের চাপ গেল নেমে।

তবুও সে হতচকিত; অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঘরে ঢুকেই পড়ল গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে। ঘুমের ঘোরে শুধু বুকুনের রেশ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল তার মুখে।

তেরো

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে লরাঁর বেশ স্ফূর্তি লাগছিল। রাতে বেশ ভাল ঘুম হয়েছে। এই তন্দ্রাতুর শোণিত প্রবাহে জানালা দিয়ে হিমেল হাওয়ার পরশ জাগালো প্রাণের প্রবাহ। গত দিনের ঘটনা যেন সে ভুলেই গেছে; শুধু ঘাড়ের দপদপানো ব্যথাটা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় সে বীভৎস স্মৃতি। জ্বলন্ত লোহার ছ্যাঁকার মত লেগেছিল ক্যামিলাসের সে মরণকামড়। প্রচণ্ড কষ্টও হচ্ছিল তার! কেউ যেন ডজন খানেক ধারালো ছুঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছিল তার চামড়ার নীচে; এমনি তীব্র সে যাতনা।

কামিজের কলার উল্টিয়ে সে আয়নায় ঘাড়ের ক্ষতটির দিকে ভাল করে তাকাল—ছোট দু-আনির মত গর্তে লাল দগদগে ঘা। চামড়া উঠে এসেছে কামড়ের সঙ্গে, থলথলে গোলাপী রং-এর মাংস ঝুলছে; আর

তাতে লেগেছে কাল কাল দাগের ছোপ। তা থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে কাঁধের উপর জমে আছে।

গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে দিতে তার মনে হল—আর ভয় নেই। দু-এক দিনের মধ্যেই ঘা-টা শুকিয়ে যাবে। তারপর সাজগোজ করে অন্য দিনের মতই নিরুদ্বেগে চলল অফিসে।

অফিসে এসে দুর্ঘটনার কাহিনী বলল সবাইকে ধরা-ধরা গলায়। খবরের কাগজে সেই দুর্ঘটনার খবর পড়ার পরে সকলের চোখে সে রীতিমত বীরপুরুষ হয়ে দাঁড়াল। পুরো একটি সপ্তাহ অরলাঁ্যা কোম্পানীর কর্মচারীদের মুখে অন্য কথা ছিল না।

লরাঁর মনে শুধু একটি মাত্র ভয় ছিল। যদি ক্যামিলাসের মৃতদেহ না সনাক্ত করা যায় ত আইনত তার মৃত্যু স্বীকার করা হবে না। থেরেসার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে ত নিশ্চয়ই; কিন্তু হত্যাকারী চায় মৃত্যুর সার্টিফিকেট বার করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে। দুর্ঘটনার পর দিন অত খোঁজাখুজির কোনই ফল হয়নি।

লরাঁ তাই রোজ শুরু করল লাস-কাটার ঘরে হাজিরা দিতে। সে চেয়েছিল নিজের চোখে ক্যামিলাসের মৃতদেহ দেখতে—সেজন্য হাজার ঘেন্না করলেও—তার বীভৎস চেহারায় বিশ্রী ভয় লাগলেও সে সেখানে ধর্ণা দেওয়া ছাড়ল না।

একদিন সকালে তার হাড় কেঁপে উঠল ভয়ে। কয়েক মিনিট ধরে সে তাকিয়েছিল একটা মড়ার দিকে—যেমন বেঁটে—তেমনি বিকৃত হয়ে গেছে সে চেহারা। গায়ের মাংস পচে এমন থকথকে হয়ে গেছে যে সামান্য জল ধারাই-এর সঙ্গে সঙ্গে তার গা থেকে খুলে যাচ্ছিল তাল তাল মাংস। যে নলের ধারার জল পড়ছিল তার মুখে—সেটার চাপে নাকের বাঁ পাশে একটা গর্ত হয়ে গেল একবার। আর তারপর হঠাৎ নাক যেন ফুলে ফেঁপে উঠল, ঠোঁট দুটো পড়ল খসে, সঙ্গে সঙ্গে

বেরিয়ে পড়ল সাদা সাদা দুপাটি দাঁত। মাথাটাও যেন অট্টহাসি করতে করতে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

যতবারই মনে হয়েছে যে ক্যামিলাসের মৃতদেহ চিনতে পেরেছে—ততবারই নিজের অন্তরে অনুভব করেছে—তীব্র বেদনা। হত্যাকাণ্ডের বলির শব খুঁজতে পাগল হয়ে উঠলেও সামনের কোন দেহ যদি তার হয় এই ভয়ে আঁৎকে উঠত সে মনে মনে। লাস-কাটা ঘরে যাতায়াত করায় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল ভয়ে, ভীতি আর দুঃস্বপ্নে। এসবকে যতই ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল, ততই যেন তাকে পেয়ে বসল এ আতংক। সেখানে এলেই ভয়ে কাঠ হয়ে পড়ত সে।

আর যখন কোন জলে-ডোবা মড়া বাকী থাকত না—লরাঁ তখন তাকিয়ে থাকত অন্য সব মৃতদেহের দিকে। নানাভাবে রাখা সে-সব মৃতদেহ দেখতে কেমন অদ্ভূত নেশা লাগত তার। রক্তাক্ত আঘাতের দাগে ভরা উলঙ্গ দেহগুলি চুম্বকের মত টানত তাকে। একদিন তার নজরে পড়ে এক গ্রাম্য তরুণীর মৃতদেহ। বেশ সুঠাম ও সুন্দর তার গড়ন। যেন ঘুমিয়ে আছে পাথরের উপর—মুখে স্তিমিত হাসির রেশ লেগে আছে তখনও। মাথাটা একটু নীচে হেলে পড়ায় বুক দেখাচ্ছে উঁচু। সেই দুধের মত সাদা অঙ্গের কোথাও এতটুকু আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু গলার চারদিকে সরু নেকলেশের মত সূক্ষ্ম একটি দাগ—আছে জড়িয়ে। তাই সাক্ষ্য দিচ্ছে—তার গলায় দড়ি দেওয়ার। বহুক্ষণ আবেশ বিহ্বল চোখে লরাঁ তাকিয়ে রইল সেই গ্রাম্য তরুণীর নগ্ন মৃতদেহের দিকে!

ওখানে যাওয়ায় লরাঁর চোখে সবই পরিচিত হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। কে কখন আসে সেখানে সবই তার মুখস্থ হয়ে গেল। এমনি করে প্রায় সপ্তাহখানেক ঘুরেও ক্যামিলাসের শব না পাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে

উঠ্‌ছিল। ঠিক করছিল আর দিন দুই দেখে—এ চেষ্টা একেবারে ছেড়েই দেবে।

কিন্তু পরদিন সকালে মর্গে যেতেই তার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠ্‌ল। ওইযে ওখানে শোয়ানো আছে ক্যামিলাসের মৃতদেহ! তারই দিকে যেন তাকিয়ে আছে সে চিৎ হয়ে; চোখদুটো আধ বোঁজা! হতভাগ্যের দিক থেকে চোখ ফেরাতে না পেরে আপনার অজান্তেই হত্যাকারী এগিয়ে গেল তার দিকে। তার মনে বিবেকের দংশন নেই। শুধু কিসের যেন হিমশীতল স্পর্শ আচ্ছন্ন করছে তার সারা দেহ! দীর্ঘ পাঁচ মিনিট সে নিশ্চুপ তাকিয়ে রইল সেদিকে—আর তার মনে ভেসে উঠল হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি দৃশ্য!

ক্যামিলাসের চেহারা হয়েছে কুৎসিত। প্রায় দু সপ্তাহ সে ছিল জলে ডুবে। সারা গায়ের মাংস কেমন থকথকে হয়ে গেছে। লরাঁ আবার দেখল তার হত্যার বলিকে ভাল করে। অন্য কোন মৃতদেহ এত বীভৎস হয়ে পড়েনি তখনো।

অবশেষে নিজেকে কোনও রকমে সেখান থেকে সরিয়ে এনে লরাঁ চলে গেল বুড়ো মিশ'র কাছে। তাঁকে গিয়ে এ খবর দিয়ে মৃতের শেষকৃত্য করবার সব ব্যবস্থা করে মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হল সে।

এবার তার সব দুশ্চিন্তার হল অবসান। সে স্বচ্ছন্দে ভুলে যেতে পারবে তার অপরাধের যত কাহিনী।

চোদ্দ

পাসাজ দ্যু পঁন্ন্যু'র দোকান ঘর পুরো তিন দিন ছিল বন্ধ। তারপর সে দোকান খোলা হলেও মনে হল আগের চেয়ে বেশী স্যাঁতসেতে আর অন্ধকার। , পরিবারের অন্য সকলের মতই যেন দোকানের মালপত্তরও মুহ্যমান, সব কিছুই এদিক-সেদিক ছড়ানো। মরচে-পড়া কাপড় ঝোলানো ডাণ্ডার পেছনে থেরেসার মুখেও পাণ্ডুর ছাপ। নিঃশব্দ নিস্তব্ধতায় সে-মুখের চেহারা হয়েছে আরও ভয়াবহ।

পাসাজ-এর সব মেয়েরাই সমবেদনায় ব্যাকুল হয়েছে। নকল জহরত বিক্রী করেন যে মহিলা তিনি থেরেসাকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার বৈধব্যের দুঃখের কথা বলেন সবাইকে।

তিন দিন মাদাম রাকুঁয়া ও থেরেসা বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। কেউ কারুর সঙ্গে কথাও বলেন নি কিংবা দেখাও করেন নি। বালিসে হেলান দিয়ে বৃদ্ধা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত। বিনামেঘে বজ্রপাতের মত পুত্রের মৃত্যু তাঁর বুকে শেল হয়ে বেজেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি এমনি চুপচাপ পড়ে থাকতেন; তারপরই হয়ত ফেটে পড়তেন কান্নায়—নয়ত প্রলাপ বকতে শুরু করতেন। পাশের ঘরে শুয়ে ছিল থেরেসা। সারা গায় চাদর জড়িয়ে পড়ে আছে সে। সে যেন মনের ভাব লুকিয়ে রাখবার জন্যেই ঘরে এসে চুপচাপ পড়ে আছে। সুজান অভ্যস্ত পরিচর্যাই করছে দুজনের।

তৃতীয় দিনে থেরেসা গায়ের চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিকারগ্রস্তের মত উঠে বসল বিছানায়। চুলের রাশ পেছনে ছড়িয়ে দিয়ে কপালে হাত দিয়ে সে বসেছিল বিছানায়—রাজ্যের ভাবনা পাগল করেছে যেন তাকে। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল সে। সারা অঙ্গ

তখন কাঁপছে। জ্বরের উত্তাপে গা যাচ্ছে জ্বলে। চামড়ার মাঝে মাঝে ধরেছে কুঞ্চন—ক'দিনে যেন বুড়িয়ে গেছে থেরেসা।

সুজান তাকে উঠে বসতে দেখে আবার শুইয়ে দিতে চাইল। তার কথায় কান না দিয়ে থেরেসা দ্রুতপায়ে কাপড়-চোপড় খুঁজে নিয়ে পরে ফেলল। জামা-কাপড় পরে আয়নায় এসে দেখল নিজের মুখ। বারে বারে চোখ রগড়াল—কি যেন মুছে ফেলতে চাইছে সে! তারপর কোন কথা না বলে চলে এল মাদাম রাকুঁয়ার ঘরে।

বৃদ্ধা তখন নিশ্চল হয়ে পড়েছিলেন। থেরেসা ঘরে ঢুকতেই তিনি তার দিকে চোখ ফেরালেন। তরুণীর পেছনে রইল তাঁর বাৎসল্য ভরা দৃষ্টি। কয়েক মুহূর্ত দুজনে চেয়ে রইলেন দুজনের দিকে। ভাগ্নীর মনে ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা; আর পিসীর অদম্য চেষ্টা সে-মুখ চেনবার জন্য। শেষে তাকে চিনতে পেরেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন নিজের বুকে আর কাঁদতে লাগলেন "বেচারা ক্যামিলাস" বলে। কান্নায় ভেঙে পড়লেন বৃদ্ধা। সে অশ্রুজল শুকিয়ে উঠল সদ্য বিধবার উত্তপ্ত চামড়ায়! সে তখন তাঁর শুকনো চোখ ঢেকে রেখেছে চাদরের আড়ালে। মা'র কান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেরেসা রইল অমনি ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এই মুহূর্তের জন্যই ছিল তার কত ভয়!

মাদাম রাকুঁয়া একটু শান্ত হলে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাঁকে নিয়ে। তাঁকে বলল নীচে দোকানে গিয়ে বসতে। বৃদ্ধাও ছোট্ট মেয়ের মত সব কথা শুনতে লাগলেন। সুজানকে দিলেন ধন্যবাদ। থেরেসার ওপর থেকে যেন তাঁর নজর সরতে চায় না। থেকে থেকেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন আর তাকে ডেকে জড়িয়ে আদরে আদরে পাগল করে বলেন, "আমার যে আর কেউ রইল না রে।"

সে সন্ধ্যেতেই তিনি উঠে বসে খেতে রাজী হলেন। এতক্ষণ থেরেসা বুঝতে পারল তাঁর শোকের মাত্রা কত গভীর! চলৎশক্তি রহিত

হয়ে গেছেন তিনি। লাঠিতে ভর করে তবেই ঠুক্ ঠুক্ করে গেলেন খাবার ঘরে।

পরদিনই শরীরের ঐ অবস্থাতেই তিনি দোকানে যেতে চাইলেন। নইলে পাগল হয়ে যাবেন বলে ভয় হল তাঁর। সেদিন থেকে শুধু অর্ধমৃতের মত বসে থাকতেন তিনি দোকানে।

তাঁর পাশে থেরেসা করত অপেক্ষা আর ভাবত কত কি।

পনেরো

দু তিনদিন অন্তরই লরঁা সন্ধ্যেবেলায় চলে আসত সেখানে। দোকানে বসে আধঘণ্টা খানেক গল্প করত মাদাম রাকুঁয়ার সঙ্গে। তারপর থেরেসার মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে যেত ফিরে। বৃদ্ধার ছিল ভাগ্নীর উদ্ধার কর্তা, উদার হৃদয় বন্ধু যে তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে চোখে সে আনবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি কিছু। তিনি সাদরেই গ্রহণ করলেন তাকে।

একদিন বিষ্যুৎবারে লরঁা দোকানে বসে থাকতে থাকতেই মিশ' ও গ্রীভে এলেন। তখন আটটা বাজে। কেরাণীর ও প্রাক্তন পুলিশের কর্তা উভয়েই নিজে নিজে ঠিক করেছিলেন আবার পুরোনো দিনের মত ধীরে ধীরে আড্ডা জমানোর কথা। তাঁদের পরেই এল অলিভিয়ের ও সুজান।

তাঁরা সবাই চলে এলেন খাবার ঘরে। মাদাম রাকুঁয়া এঁদের কাউকেই আশা করেন নি। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আলো জেলে চা তৈরী করতে লাগলেন। সবাই যথাস্থানে বসে পড়লেন যার যার চায়ের কাপ নিয়ে। তারপর পাশার ছক বার করা হলে হতভাগ্য মা'র মনে

ভেসে উঠল অতীতের স্মৃতি। অতিথিদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়েই আর অশ্রু রোধ করতে পারলেন না। একটি আসন ছিল শূন্য—তাঁর ছেলে বসত যেটিতে।

তাঁর কান্নায় বিব্রত বোধ করতে লাগলেন অতিথিরা। সকলেরই মুখে পড়ল গাম্ভীর্যের ছাপ। প্রত্যেকেরই কেমন অসোয়াস্তি লাগছিল। তাঁদের কারুরই মনে ছিল না ক্যামিলাসের কথা।

বৃদ্ধ মিশঁ বললেন, "আসুন মাদাম রাকুঁয়া, এমন করে কাঁদলে আর নিজেকে সামলাতে পারবেন না। অসুখে পড়বেন যে।"

গ্রীভে যোগ দিলেন, "আমাদের সবাইকে ত একদিন না একদিন যেতেই হবে।"

"কাঁদলেই কি আর ছেলেকে ফিরে পাবেন আপনি", গম্ভীর ভাবে বলল অলিভিয়ের।

সুজানও বলল "আসুন, আমাদের মন খারাপ করে দেবেন না এমন করে।" কিন্তু এতে কি মা'র অশ্রু বাধা মানে। তাঁর বাঁধভাঙা কান্না কিছুতেই থামছে না দেখে মিশ' শুরু করলেন,

"আসুন, একটু ধৈর্য ধরুন, আমরা এসেছি আপনাকে একটু ভুলিয়ে রাখতে। কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলে যাবার চেষ্টা করুন সব কিছু....আমরা ছু-সু'-র দান দেব কেমন? আপনি কি বলেন?"

চরম প্রচেষ্টায় অশ্রু রোধ করলেন হতভাগ্য বৃদ্ধা, বোধ হয় অতিথিদের বিব্রত অবস্থা মনে করেই তিনি সামলে নিলেন নিজেকে। বারে বারে চোখ মুছতে লাগলেন তিনি। হাতে পাশার দান কাঁপছে। ঝাপসা দেখছেন সব কিছুই।

তাঁরা খেলতে লাগলেন।

লরাঁ ও থেরেসা এই দৃশ্য দেখল গম্ভীর নৈর্বৈক্তিক অনাসক্তিতে। বিষ্যুৎবারের আড্ডা জমায় তরুণটি মনে মনে খুশীই হল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য

এর প্রয়োজন ছিল তার একান্ত। তাছাড়া কেন জানিনা এই পরিচিত পরিবেষ্টনেই ভাল লাগছিল তার। এতক্ষণে সাহসে ভর করে সে তাকাতে পারল থেরেসার মুখের দিকে—কালো পোষাক পরা বিবর্ণ, আত্মস্থ তরুণীকে নতুনরূপে রূপবতী মনে হল তার। বড় আনন্দ হল তার চোখের দিকে তাকাতে। সেও এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। থেরেসা তারই আছে তাহলে, দেহ মনে একান্ত তারই।

ষোলো

সোয়া বছর কেটে গেল এমনি করে। প্রথম মুহূর্তের ব্যথা-বেদনার তীব্রতা এল কমে। একটি করে দিন কাটে—আর আসে নব নব প্রশান্তি—কেমন নতুন উদাস-করা ভাব। জীবন বয়ে চলে অর্থহীন মন্দাক্রান্তা তালে; একঘেয়ে লাগে সব কিছু। প্রথম প্রথম লরা ও থেরেসা উভয়েই এই নতুন অভিজ্ঞতার জোয়ারে ভাসিয়ে দিল নিজেদের। তাদের অন্তরের গভীরে নবচেতনার যে ফল্গুপ্রবাহ বয়ে চলছিল—তাতেই এমন এক পরিবর্তন আনছিল দুজনের মনে যার সবিস্তার আলোচনা না করলে কিছুই বোধগম্য হবে না আর।

অতীত দিনের মত লরা শীগ্গীরই শুরু করল রীতিমত দোকানে আসতে। তবে সে আর সেখানে খেত না—সারা সন্ধ্যেটাও থাকত না বসে। ঠিক সাড়ে নটায় এসে দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেত ফিরে। বাইরে থেকে দেখলে সকলেরই মনে হবে এভাবে এসে সে এক গুরু কর্তব্য সম্পাদন করছে মহিলা দুজনের প্রতি। একদিন কোনও কারণে আসতে না পারলে পরদিন একান্ত বশংবদের মত ক্ষমা চাইত সকলের কাছে। বিষ্যুৎবার করে যে মাদাম রাকুঁয়াকে সাহায্য

করত অতিথি সৎকারের কাজে। থেরেসা চুপ করে তার কাজ করা লক্ষ্য করত। তারও মুখের পাণ্ডুর ভাব কেটে গেছে; স্বাস্থ্যও হয়েছে উজ্জ্বল; মুখে ফুটেছে হাসি আর গতি প্রকৃতি হয়েছে আরও মধুর। কচিৎ কদাচিৎ তার অধরোষ্ঠের কুঞ্চনে ফুটে উঠত ভয়-ভীতি-ব্যথা-বেদনার ছায়া।

প্রেমিক যুগল আর একান্তে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা করত না। কোন অভিসারের পরিকল্পনাও ছিল না তাদের—গোপন চুম্বনের মাদকতাও গিয়েছিল মিলিয়ে। তাদের কামার্ত দেহের লোলুপ বাসনা যেন সাময়িকভাবে উবে গেছে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ভেতরেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল যেন তাদের যৌন বুভুক্ষা। আজ সেই তীব্রতাই বিরক্তিকর হয়ে দেখা দিচ্ছে পরস্পরের প্রেমাঙ্গিলনেও।

অথচ এখন তাদের গোপন মিলনের অবকাশের অভাব ছিল না। যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হত্যালীলা সংঘটিত করল তারা—তার চরম পরিণতির পথে এখন কোন বাধাই ছিল না আর। সারা বাড়ীরই কর্তা তারা; যেখানে খুসী, যখন ইচ্ছা তারা বেড়াতে যেতে পারে। কিন্তু প্রেমের সেই সর্বগ্রাসী আকর্ষণ যেন ছিল না আর তাদের। তারা প্রশান্ত চিত্তে করত আলাপ, চাহনিতে লজ্জা কি কামনা-বাসনার সামান্য ছাপও থাকত না তাদের; মুছেই গেছে যেন মন থেকে ক'দিন আগের সেই পাশবিক প্রেমাভিনয়ের স্মৃতি। বরঞ্চ ইচ্ছে করেই যেন তারা আর একলা থাকতে চাইত না। একা একা থাকলেই সমস্যা দেখা দিত কি গল্প তারা করবে। বিদায়ের কর মর্দনের সময়ও চর্মের ঘর্ষণে লাগত তাদের অসোয়াস্তি।

উভয়েরই কিন্তু মনে হত এরকম মনোভাবের কারণ তারা বেশ ভাল করেই জানে। তাদের এই উদাসীনভাবের কারণ মনে করত সাবধানতা। অনেক ভেবেচিন্তেই যেন তারা এই অভিনয় করে চলেছে।

নিজেদের বোঝাতে চাইল যে, ইচ্ছে করেই তারা চলেছে এ পথে। আবার এ অসোয়াস্তির পেছনে যে শাস্তির ভয় একবারেই ছিল না তাও নয়। অনেক সময় তারা প্রচণ্ড চেষ্টা করত আগের মতই বাসনালোলুপ জীবন কাটাতে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও মনের সেই ভাব ফিরিয়ে আনতে পারত না কেউ। তখন তাদের সম্বল হল বিয়ের ভাবনা। বিয়ে হলেই যেন তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কামনা বাসনার যে লেলিহ জীবনের স্বপ্ন তারা দেখেছে এতদিন, বিয়ের পর যেন আপন থেকেই হবে সে জীবন তাদের করায়ত্ত। এই আশাই বাঁচিয়ে রাখল তাদের ; নয়ত কোথায় কোন শূন্যতার অতলে তলিয়ে যেত তারা দুজনে। দুজনেই মনকে প্রবোধ দিত এই বলে যে আগের মতই তারা ভালবাসে একে অন্যকে, এখন শুধু অপেক্ষা করছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেই প্রেমের সার্থক পরিণতির।

থেরেসার মন এত শান্ত ছিল না কোনদিন। জীবনের যত তীব্র বাসনারাজির গ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে পড়েছে তার। রাতে একা একা বিছানায় শুয়ে কি ভালই লাগে তার ; শয্যাসঙ্গী ক্যামিলাসের রোগজীর্ণ দেহ ও বিশুষ্ক মুখের বিরক্তিকর সাহচর্য থেকে সে মুক্ত। শৈশবের কথা মনে পড়ছে তার ; কুমারীকালের প্রশান্তি যেন তার মনে। বড় ভাল লাগল তার কাছে ঐ বিরাট প্রশস্ত ঘরের নির্জন নিঃসঙ্গতা। জানালার ওপাশের উঁচু দেয়ালের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেও তার কত ভাল লাগল। হঠাৎ দুঃস্বপ্নের মত ছাড়া লরাঁর কথা মনেই হত না তার। দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে বিস্ফারিত চোখে সে তখন বিছানায় বসে প্রহর গুণত। সেই দুর্বল মুহূর্তে মনে হত হয়ত কোনও বলিষ্ঠ পুরুষকে শয্যাসঙ্গী পেলে তার এ দুঃস্বপ্নের ঘটবে অবসান। বিশ্বাসী কুকুরের মত তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই শুধু প্রণয়ীর কথা মনে উঠত

মাঝে মাঝে ; নয়ত তার হিমশীতল দেহের শীতল অনুপরমাণুর কোথাও কামনার লেশ মাত্র অনুভূতি ছিল না।

দিনের বেলা দোকানে এসে সে ডুবে যেত চারপাশের ঘটনার স্রোতে। আগের মত তীব্র অন্তর্জ্বালা আর ছিল না তার। একা বসে বসে আর চিন্তা করতে ভাল লাগত না তার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাসাজ-এর লোকের যাতায়াত লক্ষ্য করতে লাগল। সেই শব্দ ও হৈ চৈ তাকে মাতিয়ে রাখল কিছুটা। এতদিনে সে হল কুতুহলী—সত্যিকার মেয়ে। এর আগে পর্যন্ত তার ভাবনা চিন্তা সব কিছুই ছিল পুরুষালী ঢং-এর।

পাসাজ-এ লক্ষ্য রাখতে রাখতে একজন সুন্দর তরুণ পড়ল তার নজরে। দিনে বহুবার দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত ছিল তার। থেরেসা তারই প্রেমে পড়ে গেল। গোটা একটি সপ্তাহ ধরে সে তার প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রইল। এখন সে উপন্যাস পড়া ধরেছিল। তরুণ ছাত্রটিকে মনে মনে তুলনা করত লরাঁর সঙ্গে। তুলনায় লরাঁকে মনে হত জঘন্য জংলী বলে। উপন্যাস পাঠে তার মনের এক নতুন দিক খুলে গেল—এতদিন শুধু দেহের অনুপরমাণু, রক্তের দাবদাহে সে পেয়েছে প্রেমের স্পর্শ ; আর আজ সে ভালবাসতে শিখেছে সজাগ মন নিয়ে। তারপর একদিন কোথায় মিলিয়ে গেল ছাত্রটি। থেরেসাও তাকে ভুলে গেল কয়েক ঘণ্টা পরেই।

একটি লাইব্রেরীতে ভর্তি হয়ে সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল যত রাজ্যের উপন্যাস। আর প্রতিটি বই-এরই নায়কের সঙ্গেই আকণ্ঠ মজে রইল প্রেমে। হঠাৎ বই পড়ার এই বাতিক তার মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করল। অস্থিরতা গেল বেড়ে, অকারণে হঠাৎ হাসি কান্না আসে বেরিয়ে। সুদীর্ঘদিনের অভ্যস্ত স্থৈর্যের বাঁধও রইল না অটুট। স্মৃতি মন্থনে আকুল হয়ে উঠল সে। কখনো কখনো

ক্যামিলাসের স্মৃতি চমকে দিত তাকে; তখন লরার কথা মনে পড়ে রক্তে ধরত নতুন নেশার জোয়ার। তবে ভয় করত এখন—অবিশ্বাসী সন্দেহ জাগত মনে। কখনো মনে হত দুর ছাই সব চুকিয়ে দিয়ে প্রণয়ীকে বিয়ে করে ফেলাই ভাল, আবার কখনো কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ভাবত আর দেখাই করবে না তার সঙ্গে চিরজীবনে। উপন্যাসে সতীত্ব ও আত্মসম্মান-এর নানা কাহিনী পড়ে নিজের সহজাত প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির ভিতর গড়ে তুলেছিল বিরাট বাধার প্রাচীর। মনে মনে সে আগেকার মতই অদম্য ইচ্ছাশক্তির বশীভূত হয়ে রইলেও ভালমন্দের, সদসতের ধারণা এসেছে এতদিনে তার মধ্যে। অলিভিয়েরের স্ত্রীর চলাফেরা, মুখের ভাব এখন আর তার বুঝতে কষ্ট হয় না। সে এটুকু শিখেছে যে সুখী হতে চাইলেই যে রমণীর পক্ষে স্বামী হত্যার প্রয়োজন আছে তা নয়।

লরাও নানা ভাববৈচিত্রের ভেতর দিন কাটাচ্ছিল। প্রথমে মনে এল গভীর আয়েস—বিরাট বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেলে যেমন হয়। কখনো কখনো মনে হত সে দুঃস্বপ্ন দেখছে, জিজ্ঞেস করত নিজেকেই নিজে নানা কথা। প্রশ্ন করত সেই কি সত্যি ক্যামিলাসকে ডুবিয়ে মেরেছে নদীর অতলে? স্মৃতির ভারে পীড়িত না হলে সে ভাবতেই পারত না কখনো খুন করতে পারে কাউকে। হিসেবনিকশী মনের সমস্ত বিচক্ষণতা সত্ত্বেও ভীরুতায় উঠত কেঁপে। কপালে দেখা দিত স্বেদ বিন্দু যখন চোখে ভাসত একটু হলেই হয়ত তাকে গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হতো! ঠিক সেই মুহূর্তেই কাঁধে লাগত তীক্ষ্ণ ছুরির শীতল স্পর্শ। এতদিন পর্যন্ত জন্তু জানোয়ারের মত একগুঁয়েমির কাজ করেছে সে। এবার ফিরে তাকাল পিছনে। কি সাংঘাতিক অতলস্পর্শী গহ্বর পেরিয়ে এসেছে সে। ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়ত তখন।

"মেয়েটির সাহচর্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বোধ হয়", ভাবল সে

"কি বোকামীই না করেছি। গিলোটিনে পেতে দিয়েছিলাম মাথাটা। যাক সব কিছু ভালয় ভালয় মিটে গেছে।....আর ও পথে পা বাড়াচ্ছি না, বাবা।"

এই ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার ভারে নুয়ে পড়ল লরাঁ। হুঁশিয়ারী গেল শতগুণে বেড়ে। আস্তে আস্তে গায় জমল মেদ, হাব-ভাব হল অপরিচ্ছন্ন। কেউ তাকে দেখলে ভাবতে পারতো না যে একদিন সেই আসলে বন্ধু হত্যা করেছে।

সে ফিরে এল পুরোনো জীবনের বৃত্তে। আদর্শ কেরানী জীবনযাপন করল কয়েক মাস; রাতে রু সঁ্যা ভিক্তর-এর কোন সস্তা হোটেলে খেয়ে চেয়ার হেলান দিয়ে পাইপ টানত বসে বসে। দিনের কাজের চাপে কিছুই মনে হত না তার; আর রাতে গভীর নিদ্রায় যেত ডুবে। বেশ আনন্দেই কাটছিল তার দিন।

কামনা বাসনার আর সে দাবদাহ নেই। থেরেসার কথাও মনে হয় কচিৎ। ভাবী বধূর কথা মনে হলে যেমন অনাগত দিনের ছবিতে মন আবিষ্ট্য হয়ে পড়ে, থেরেসার কথা মনে হলে তারও ঠিক ঐ ভাব জাগে মনে। তখন বধূর কথা যায় ভুলে; মনে হয় শুধু বিয়ের পর কি করবে না করবে তারই শত সহস্র খুঁটিনাটি কথা। সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তখন খেয়াল খুশীর জন্য ছবি আঁকতে শুরু করবে। এই আশাতেই আসত রোজ পাসাজ-এ। অস্বস্তি লাগলেও আসতে কামাই করত না কখনো।

এক রবিবারে আর কোন কাজ ভাল না লাগায় সে গেল পুরনো ছাত্রাবস্থার এক শিল্পী বন্ধুর কাছে। শিল্পী তখন সাঁলোর প্রতিযোগিতায় দেবার জন্য একটি নারীমূর্তির ছবি আঁকছিল। স্টুডিওর পেছনে ছিল মডেলটি—উত্থিত নিতম্বা, দৃঢ় বক্ষা। মাথা হেলিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিল সেখানে। কথার মাঝে মাঝে সে উঠছিল হেসে আর সারা

দেহে লাগছিল সে-হাসির দোলা। কখনো হাত পা ছড়িয়ে নানা ভঙ্গীতে জড়তা কাটাচ্ছিল শরীরের। লরাঁ তার সামনে বসে লক্ষ্য করছিল সে দেহ লালিত্য আর গল্প করছিল বন্ধুর সঙ্গে। নগ্ন নারী দেহের আবেশ বিভোল মূর্তি আবার তার রক্তে বান ডাকলো। সন্ধ্যে পর্যন্ত সে বসে রইল সেখানে। তারপর মেয়েটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এল নিজের বাসায়। প্রায় এক বছর ধরে মেয়েটি তার রক্ষিতা হয়ে রইল। অবশেষে বেচারা তার প্রেমেই পড়ে গেল রীতিমত। ভোরে যেত বেরিয়ে শিল্পীদের মডেল হতে ; তারপর দিনান্তে বাঁধা ছকের শেষে ফিরে আসত লরাঁর কাছে। নিজের রোজগারেই চলত তার দিন। লরাঁর ঘাড়ে মোটেই বোঝা হয়ে দেখা দেয়নি সে। লরাঁও তাকে জিজ্ঞেস করত না কোন কথা। এই মেয়েটি তার জীবনে আরও আনল শাম্য। এভাবে অন্য রমণীকে ভালবেসে সে থেরেসার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে কিনা সে প্রশ্নই জাগেনি তার মনে কখনও।

ইতিমধ্যে থেরেসার শোককাল উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আবার নানা রঙের পোশাক চড়ল তার গায়ে। তারপর এক বিরল সন্ধ্যেয় লরাঁর চোখেও তাকে নতুন করে সুন্দরী বলে মনে হল। তবু থেরেসার সম্মুখে অস্বস্তি লাগে তার।

প্রণয়ীনীর স্নায়বিকতা, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য লরাঁকে ভীত চকিত করে তুলত। তার চেয়ে ভাল লাগত নিজের গণ্ডীর ভেতরে চুপ করে বসে থাকতে। থেরেসাকে বশে আনতে হলে আবার নতুন করে চেষ্টা করতে হবে তাকে। এই ভয়ে সে পেছিয়ে আসতে চাইল।

তবু তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা গেল না তার। ক্যামিলাস মরেছে প্রায় সোয়া বছর হল। এবার সত্যি সত্যি তাকে বিয়ের কথা ভাবতে হয়। এক একবার আশংকা হয় এ পথে পা বাড়াবে কিনা ; আবার সব ভয় কেটে যায় এই কথা ভেবে তাহলে নরহত্যা করল কেন ?

যে রমণীর জন্যে সে এই নারকীয় খুন করতেও দ্বিধা বোধ করেনি আজ যদি তাকে বিয়েই না করে তাহলে কি কাজ ছিল এ-হত্যালীলায়? এ চিন্তায় আবার তার অন্তরের অতলে ঠাঁই নিল থেরেসা। তার অস্পষ্ট আহ্বান বাজছে লরাঁর কানে—সেও যে থেরেসারই! তাছাড়া সে সহকর্মীকে করে ভয়। তাকে এখন বিয়ে না করলে যদি সে পুলিশে খবর দেয়? মেয়েরা ঈর্ষার বশে ত সবই পারে। মাথায় যতই এসব চিন্তা গিজগিজ করতে লাগল ততই চঞ্চল হয়ে উঠল লরাঁ।

ঠিক এই সংকট সময়েই তার রক্ষিতা মডেলটি ছেড়ে গেল তাকে। কোন এক রবিবার থেকে সে হল উধাও। হয়ত আরও কার উত্তাপ ব্যাকুল শয্যাসঙ্গিনী এখন সে। লরাঁ তাতে বিচলিত হয় নি মোটেই। তবে এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল নিশীথ শয্যাসঙ্গিনীর সাহচর্যে। হঠাৎ বড় শূন্য লাগে নিজের সঙ্গিহীন শয্যা। সপ্তাহ খানেক পরেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল যৌবন। আবার সে সময় কাটাতে লাগল পাসাজ-এর দোকানে। স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে থেরেসার দিকে—চোখে কামনার ঝিলিক। তরুণীও উপন্যাস পাঠের ফলে প্রগলভা প্রণয়ীর অভিনয় শুরু করল তার সঙ্গে।

এই ভাবে উভয়েই ফিরে এল কামনার প্রয়াগসঙ্গমে। একদিন রাত্রে দোকান বন্ধ করতে করতে থেরেসাকে থামিয়ে দিয়ে সে কামনা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল:

"আজ রাতে আসব তোমার কাছে?" তরুণীর চোখে শঙ্কার ছায়া রেখাপাত করল। "না, না আরও কিছুদিন যাক না...."

"আর কত দেরী করব? আর পারি না। তোমাকে আমার চাই-ই...." বিভ্রান্তের মত থেরেসা বলল: "বিয়েটা হতে দেও তখন ত তোমারই হব যে।"

সতেরো

অবদমিত অধীর আগ্রহে মনে অসোয়াস্তি নিয়ে ফিরল লরাঁ। থেরেসার উষ্ণ শ্বাসপ্রবাহে, তার সম্মতিতে আবার ধরিয়ে দিয়েছে রক্তে সেই পুরানো জ্বালা। জেটির পথে ঘুরে ঘুরে অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করল সে। তারপর বাড়ী ফিরল।

রু স্যাঁ ভিক্তর-এ এসে কেমন যেন একা-একা নিজের ঘরে ঢুকতে ভয় হল তার। ছেলেমানুষের মত এক অবোধ্য ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বিভীষিকা আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। কেবলই আশংকা হতে লাগল কে যেন লুকিয়ে আছে তার ঘরে। এ জাতীয় কাপুরুষোচিত চিন্তার দাস সে হয়নি কখনো।

আতংকে অস্থির হয়ে সে চলে এল এক মদের দোকানে। সেখানে নিঃশব্দে পান করে চলল গ্লাসের পর গ্লাস মদ। তারপর দোকান বন্ধ হলে অগত্যা উঠতে হল তাকে। এক বাক্স দিয়াশলাই নিয়ে ঘরের দিকে চলল ভীত চকিত পদে। ভেতরের দরজা বন্ধ। ঘরে ঢুকবার পথে জমাট অন্ধকারের ভেতর একটা বড় বারান্দা দিয়ে যেতে হয় তাকে। সেই ভীষণ অন্ধকারের কথা মনে হতেই হাত পা অবশ হয়ে এল। কাউকে ডাকতেও তেমন সাহস হচ্ছিল না তার। অথচ না ডেকেও উপায় নেই। অবশেষে ডাকতেও হল তাকে। দরজা খুলিয়ে মোমবাতি জ্বেলে সে সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল বারান্দার ভেতর। একটু যেতেই বাতি গেল নিভে! আর অশরীরী আতংকে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। কানে আসছে কত লোকের অস্ফুট গুঞ্জন, পায়ের আওয়াজ, ছুটোছুটি দাপাদাপির শব্দ। আর পারছে না সে সহ্য করতে। তবুও কোনও রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে এল নিজের ঘরে।

ঘরে ঢুকেই প্রথম কাজ হল আলো জ্বেলে—আঁতিপাতি করে খোঁজা—কেউ লুকিয়ে আছে নাকি সে-ঘরে। পাছে কেউ স্কাইলাইট দিয়ে ভেতরে ঢোকে সেই ভয়ে দিল সেটা বন্ধ করে। এতক্ষণে সে আশ্বস্ত হল। আশ্চর্য হয়ে গেল নিজেরই ছেলেমানুষীতে। হাসি পেল—নিজেরই ব্যবহারে!

এবার নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় গা এলিয়ে দিল লরাঁ। আতঙ্কে, ভয়ে থেরেসার কথা মনেই হয়নি তার এতক্ষণ। বিছানার উষ্ণ আবেশে মনে পড়ল আবার থেরেসাকে। চোখ বুঁজে যতই জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করে সে ততই যেন কে তার মাথায় ঢুকিয়ে দেয় যত রাজ্যের দুঃস্বপ্ন। বারংবার বিফল চেষ্টা করতে লাগল ঘুমোবার। থেরেসাকে ঘিরে যত রাজ্যের ভাবনা পাগল করে তুলল তাকে।

ঘুম যখন কিছুতেই এল না তার চোখে—সে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবনার লাগাম দিল ছেড়ে। মনে হল তখনই চলে যায় পাসাজ-এ থেরেসার ঘরে।

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সে বুঝি সত্যি সত্যি চলেছে অভিসারে। কোন পথ দিয়ে কি ভাবে এঁকে বেঁকে সে যাবে সেখানে—তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছবি ভেসে উঠল তার মনে। অন্যের অলক্ষ্যে সে যেন থেরেসার ঘরে চলে এসেছে। তারপর শুরু হয়েছে তাদের সেই আগের প্রেমের উল্লাস। মনে পড়ল—আবেশ বিভোল থেরেসাকে নিয়ে তার আনন্দের মুহূর্তগুলির কথা। বলাকা শুভ্র পোশাকে—থেরেসা যেন আকুল আহ্বান করছে তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে।

সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারেই তার চোখের সামনে ভেসে চলেছে দৃশ্যের পর দৃশ্য। থেরেসার চিন্তায় পাগল হয়ে কখন লাফিয়ে উঠেছে বিছানা থেকে। এখনি বোধহয় চলে যাবে পাসাজ-এ। কিন্তু না—

খুট করে আওয়াজ হল যেন কিসের। আবার সেই অন্ধকার বারান্দা দিয়ে যাবার কথা মনে হতেই হিম হয়ে গেল তার গায়ের রক্ত। গুটি গুটি এসে শুয়ে পড়ল আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে।

শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসেছে—জ্বলছে সারা দেহ। ঘাড়ের পাশে যেন কিসের জ্বালা। হাত দিতেই মনে পড়ল ক্যামিলাসের কামড়ানোর কথা। ক্যামিলাসের প্রেতাত্মা কি প্রতিশোধের নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে? এই বুঝি টানল তার বিছানা—আতংকে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল লরাঁর। বিছানা থেকে পড়লেই—ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্যামিলাস তার ওপর; প্রতিশোধ নেবে হত্যার।

একটু স্থির হলেই মনে হল, না বিছানা নড়ছে না। মনোভাবের পরিবর্তন হল তার। মোমবাতি জ্বেলে বড় একগ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল!....এবার আর সে করবে না কিছুর ভাবনা। শুধু মনে হল অত মদ খাওয়া ঠিক হয়নি তার। উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে আসছে দেহ। অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে সে। ঘুম ত নয় কিসের মোহ যেন পেয়ে বসেছে তাকে।

তারপরে আধ ঘুমে যখন বিভোর, ধীরে ধীরে রাজ্যের চিন্তা আবার ভিড় জমালো তার মাথায়। আবার সেই দৃশ্য—সে চলেছে থেরেসার কাছে। কিন্তু এবার পেটিকোট পরিহিতা নগ্নবক্ষা থেরেসা তার অভ্যর্থনায় এগিয়ে এল না—যে এল সে হচ্ছে ক্যামিলাস—লাসঘরে তাকে যেমনটি দেখেছে—ঠিক তেমনি বীভৎস। সে গলিত শব অট্টহাস্য করে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে তাকে।

আতংকে, ভয়ে চীৎকার করে ঘুম ভেঙে গেল লরাঁর। আবার সারা গায় চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমের চেষ্টা করল সে। প্রতিবার ঘুমের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সে নিজের উপর।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল লরাঁ। আবার সেই থেরেসার অভিসারের

দৃশ্য ভেসে উঠল তার মানসপটে। তারপর ক্যামিলাসের শব রইল তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে।

আর শুয়ে থাকা সম্ভব হল না তার। ওদিকে ক্ষীণ উষার আলো ঝিলিক মারছে জানালায়।

চাপা বিরক্তির সঙ্গে সে সাজগোজ করল। রাত্রির অনিদ্রায় আজ সারা দেহ-মন অবশ। দিনের আলোয় রাতের ঘটনাটীকে একান্ত ছেলে-মানুষী বলে মনে হচ্ছে তার। শুধু মনে হচ্ছে থেরেসা যদি রাজী হত —তাহলে তার এত দুর্ভোগ ভোগ করতে হত না সারা রাত। থেরেসা পাশে থাকলে তার এ চিন্তা হত না, এ কথা ভাবতেই মন শান্ত হল কিছুটা। চোখে মুখে খুব ভাল করে জলের ঝাপ্টা দিয়ে সে চাঙা হয়ে উঠল। থেরেসার কয়েকটি উত্তপ্ত চুম্বন এনে দেবে তার মনে প্রশান্তি। অশরীরী আতংক যাবে দূর হয়ে।

টুপী পরে সে বেরিয়ে এল। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় রাতের কথা মনে পড়ে হাসি পেল তার। কি বোকার মত ভয় পেয়েছে সে কাল সারা রাত ধরে।

সারা দিনটাও কাটল তার তেমনি। চোখ ভেঙে আসছে ঘুমে অথচ ঘুমোবার উপায় নেই। তবু সেই অবসন্ন দেহেই সে পাশাজ-এ এল সন্ধ্যের মুখোমুখী। থেরেসাকে মনে হল—তারই মত অবসন্ন, ম্লান।

মাদাম রাকুঁয়া বললেন, "থেরেসা কাল সারা রাত ঘুমোতে পারে নি—বড় বিশ্রী কেটেছে গত রাতটা। পিসীর কথার সময় থেরেসা একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল লরাঁর দিকে। উভয়ে বোধহয় বুঝল উভয়ের মনের কথা। রাত দশটা পর্যন্ত তেমনি মুখোমুখী বসে রইল তারা দুজন। অতি সাধারণ কথা বার্তা হল দুচারটে আর চোখের অন্ধ আবেগে মিনতি জানাল একে অন্যকে তাদের মিলন লগ্ন ত্বরান্বিত করতে।

আঠারো

থেরেসারও রাত কেটেছে ক্যামিলাসের প্রেতাত্মার রোমহর্ষক সাহচর্যে, আতংকে আর ভয়ে। প্রায় এক বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পর সেদিন রাতে লরাঁর মিলনের প্রস্তাবে তারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অন্ধ আবেগ আকুল করেছিল তাকেও। নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে সে কথা ভাবতে ভাবতে তার রক্তে' জ্বলল আগুন। তারপরই শুরু হল অনিদ্রার যন্ত্রণা আর দুঃস্বপ্নের অসোয়াস্তি। সেই নরক যন্ত্রণার মধ্যে ফুটে উঠল নিমজ্জিত হতভাগ্যের মুখছবি। মনে হল প্রেমিকের সবল বাহুপাশে আশ্রয় নিলে আর এ যম-যাতনা ভোগ করতে হবে না তাকে।

একই মুহূর্তে উভয়ের মনে খেলে যায় একই চেতনার বিদ্যুৎ ঝলক। স্নায়ুকেন্দ্রে আসে অবসাদ। ভীতি-চকিত, রোমহর্ষক আতংকে কণ্টকিত উভয়ের দেহ। আতংকের মিলিয়ে দিয়েছে তাদের একাত্মা করে।

এই একাত্মতার অদৃশ্য শৃঙ্খল থেরেসা ও লরাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল সোয়া বছর ধরে। অথচ হত্যাকাণ্ডের পর অবসাদে আচ্ছন্ন মুহূর্তে উভয়ে মনে করেছিল বিভিন্ন খাদে স্বাধীন জীবনযাত্রা চলেছে তাদের!

অপরাধী যুগলের এ স্বাধীনতার স্বাদ ছিল একান্তই ক্ষণিক। আজ তারা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে শৃঙ্খলের ঝনাৎকার পাগল করে তুলেছে তাদের। ঠেলে দিয়েছে অপরাধী যুগলকে একে অন্যের বুকে। বিচ্ছিন্ন হবার উপায় নেই তাদের।

পর দিনই থেরেসা গোপনে গোপনে লরাঁর সঙ্গে বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগল। কাজটা বেশ কঠিন, বিপদসংকুলও বটে। পাছে সামান্য হঠকারিতায় তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এই দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠল প্রেমিক যুগল। নিজেদের মুখে বিয়ের কথা ওঠানোর চেয়ে তারা মতলব ভাঁজল মাদাম রাঁকুয়াকে দিয়েই তোলাবে সে প্রস্তাব।

তার জন্যে দরকার বিষ্যুৎবারের অতিথিদের মাথায় একবার ঢুকিয়ে দেওয়া যে, থেরেসার আবার বিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলেই বাকীটা আপনা আপনি হয়ে যাবে ঠিক।

নিপুণ অভিনয়ের প্রয়োজন এই কৌতুক নাট্য রচনায়। স্বভাবপটুত্বে নিজের নিজের চরিত্র অভিনয় শুরু করল থেরেসা ও লরাঁ। মনে মনে যত শীগগীরই মিলন কামনা করুক না তারা—বাইরের চালচলনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হল তাদের। মুহূর্তের বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না তাদের।

প্রতি রাত্রে ক্যামিলাসের প্রেতাত্মা শান্তিভঙ্গ করে প্রণয়ীযুগলের সুখনিদ্রার। এই বিরক্তি প্রবাহেই আরও তীব্র হয়ে উঠতে লাগল তাদের মিলন আকাঙ্ক্ষা।

একা একা শোবার ঘরে যেতেই ভয় করত থেরেসার। শেষে সারারাত মোমবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকতে আরম্ভ করে সে। অবসাদে দু'চোখ জড়িয়ে এলেই ভেসে উঠত ক্যামিলাসের বীভৎস মূর্তি।

লরাঁও বারান্দা দিয়ে যাবার সময় প্রথম যেদিন ভয় পেল তখন থেকে হয়ে পড়ল চরম কাপুরুষ। সেই আতংকের শিহরণ ছাড়েনি তাকে তখন পর্যন্ত। রাত্তিরে তার ভোগান্তি হয় থেরেসার চেয়েও বেশী। কোনও কোনও দিন ঘরে ঢোকবার ভয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সারা রাত কাটিয়ে দিত সে।

তার দুঃস্বপ্নের মূল ছিল ব্যাকুল চিন্তা—থেরেসার সঙ্গে মিলন মুহূর্তের ছবি ভেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে, তার উদগ্র আলিঙ্গনের চাপ যখন শিহরিত করেছে তার দেহের প্রতিরোমকূপ ঠিক তখনি কে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিত নীচে পূতিগন্ধময় গলিত শব ক্যামিলাসের বুকে। গলিত শবের দুর্গন্ধে দম আটকে মরার উপক্রম হত তার।

এ যাতনা উপশম হবার কোন লক্ষণই দেখা দিল না। শুধু এতটুকু

শান্তি, প্রশান্ত নিদ্রার আশায় ব্যাকুল প্রণয়ীযুগল চাইল তাদের মিলন।

ভীতিব্যাকুল আতংকের হাত থেকে রক্ষা পেতে আর লরাঁর পরুষ আলিঙ্গনের বলিষ্ঠতায় নারীত্বের মাধুর্য অনুভূতির কামনায় থেরেসা ছিল ব্যগ্র। কামনার শিহরণ ও অশরীরী আতংকে উন্মাদের মত হল তার মানসিক অবস্থা। উপন্যাস পাঠে চঞ্চলমতি থেরেসার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়েছিল একেবারে। শুধু অত্যুগ্র কামনার অবসাদ ঘিরে ফেলল তাকে। লরাঁর বলিষ্ঠ আলিঙ্গন হল অপরিহার্য।

লরাঁর মনে থেরেসার সঙ্গলিপ্সার চেয়েও বড় কথা ছিল ক্যামিলাসের স্থান দখল করে বৃদ্ধা রাকুঁয়ার সঞ্চিত অর্থে অলস দিন যাপন। শুধু মাত্র থেরেসার জন্য সে কখনই এই হত্যাকাণ্ড ঘটাত না। ক্যামিলাসকে খুন করে থেরেসার সাহচর্যে আলস্য বিলাসে দিন কাটাবে বলেই এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল সে। আজ সেই নাটকের শেষ অঙ্কে এসে পিছিয়ে গেলে চলবে কেমন করে? থেরেসাকেও যেমন চাই তেমনি মাদাম রাকুঁয়ার সম্পত্তিও চাই তার। সেজন্যেই প্রয়োজন থেরেসাকে বিয়ে করা।

তবে বৃথা এ সুখের স্বপ্ন। হঠাৎ আতংকের হিমশীতল স্পর্শ চমকে দিয়ে গেল তাকে।

এবার থেরেসা ও লরাঁর গোপন প্রচেষ্টা ফলবতী হবার লক্ষণ দেখা দিল। থেরেসার মুখের ম্লানিমা ও হতাশার ছাপের গভীরতায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন মাদাম রাকুঁয়া। বৃদ্ধা কত চেষ্টা করলেন তার মনের ব্যথা বেদনার খোঁজ করতে। সদ্য স্বামী বিয়োগবিধুরা বিধবার মত থেরেসা চমৎকার অভিনয় করে গেল—কখনো বিরক্ত লাগে তার সব কাজে, কখনো অকারণ ব্যথার ঝিলিক মারে সারা শরীরে, সব কিছুই অস্পষ্ট আর ভাসাভাসা। পিসী খুঁটিয়ে জিজ্ঞেসবাদ করলে বলে, "না ত, বেশ

ভালই আছি। কে জানে কেন যে কিছু ভাল লাগে না ছাই। কথা-কটি বলেই হাই তুলে এক গভীর দীর্ঘশ্বাসে আরও ব্যাকুল করে তুলত পিসীকে। এই শোকাতাপা তরুণীকে নিয়ে মাদাম পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। কি যে করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। এই এক ভাইঝি ছাড়া যে বিশ্বচরাচরে তাঁর আর কেউ নেই কোথাও! মনে মনে রোজ তাই প্রার্থনা জানান ভগবানের কাছে যেন তাকে রেখে চোখ বুঁজতে পারেন তিনি।

আর কোন পথ না পেয়ে একদিন খোলাখুলি জিজ্ঞেসই করে বসলেন মিশঁকে। এক বিষ্যুৎবারে তাকে দোকানের একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন থেরেসার ভাবভঙ্গীর কথা।

"তাত হবেই", আগের মত সহজ ও ঘনিষ্ঠ সুরে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ। "অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করেছি ওর হালচাল সব। বলেও দিতে পারি কেন এমন হচ্ছে তার।"

"সত্যি বলতে পারেন?" ব্যকুলতা মাদাম-এর স্বরে। "বলুন না যদি এখনো তাকে সারানো যায়।"

"এতো সোজা কথা।" স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন মিশঁ। "একা একা অত বড় ঘরে নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে হাঁফিয়ে উঠেছে আপনার ভাইঝি। ওকে আবার বিয়ে দিন—ওর চোখের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়।"

প্রাক্তন পুলিশ কর্তার এই স্পষ্টবাদীতায় নিদারুণ আঘাত পেলেন বৃদ্ধা। তাঁর ধারণা ছিল সন্তান বিয়োগ-ব্যথা যেমন তাঁর অন্তর পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছে, স্বামী বিয়োগে নিশ্চয় থেরেসারও সেই অবস্থা হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি ভাবতেই পারেন না যে, থেরেসা আবার বিয়ে করতে পারে। অথচ আশ্চর্য, মিশঁ বলছেন সেই থেরেসাকেই বিয়ে দেবার কথা।

"শুকিয়ে ঝরে পড়বার আগেই ওর বিয়ে দিয়ে দিন। আমার কথা শুনুন।"

পুত্রের স্মৃতি এত সহজেই মুছে যাবে তাঁর চারপাশ থেকে! এর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া এত সহজ হল না বৃদ্ধার। কান্না পেল তাঁর। দ্বিতীয়বার যেন মরল ক্যামিলাস তাঁর কোলে! তারপর কাঁদতে কাঁদতে যখন শুকিয়ে গেল কান্না তখন ধীরে ধীরে উঠে বসে ভাবতে লাগলেন মিশ'র প্রস্তাবের কথা। থেরেসার বিয়ে না দেওয়ায় নিজেকেই অপরাধী মনে হতে লাগল তাঁর। একা একা থেরেসার সামনে যেতেই বুক কেঁপে উঠছিল। অন্য কঠিন-হৃদয় মাতার মত তাঁর মনে কাঠিন্যের লেশ মাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন স্বভাব কোমল। যেদিন থেকে ভাইঝিকে দেখেছেন শুকনো মুখে দোকানের এককোণে মরার মত বসে থাকতে, সেদিন থেকেই তাঁর বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার কথা ভেবে। কি করলে থেরেসার মুখে আবার হাসি ফুটবে তার জন্যে কত কিছু ভেবেছেন। তাকে সুখী করবার কথা এত করে ভেবেছিলেন বলেই পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে সায় দিলেন অবশেষে। ছেলের স্মৃতিও যেন মলিন হয়ে এল একটু। তাঁর সেই হেজে-মজে যাওয়া জীবনে আবার হিল্লোল লাগল একটু। নবীন আনন্দের রেখাপাত হল সেই স্তব্ধ গম্ভীর জীবনে। ভাইঝির জন্য পাত্র দেখায় মন দিলেন তিনি! তবে পাত্র খোঁজা বড় কঠিন সমস্যা। পাত্র খুঁজতে গিয়ে থেরেসার চেয়ে নিজের কথাই মনে আসতে লাগল বেশী করে। মনে মনে ভয় হল যদি নতুন জামাই এসে তাঁর শেষ জীবনের সুখের নীড় দেয় ভেঙে। অপরিচিত কাকে আবার ঘরে আনবেন সেই ভয়েই তিনি ভাইঝিকে প্রকাশ্যে বিয়ের প্রস্তাব করেন নি।

থেরেসা যখন স্বভাজাত নিপুণ ভণ্ডামীর মুখোসে ম্লান মুখে বসে থাকত এক কোণে লরাঁ তখন অভিনয় করত একান্ত বশংবদ বন্ধুর!

মহিলা তুজনের জন্য সে কিছু না কিছু করছেই। বিশেষ করে মাদাম রাকুয়ার সাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার ছিল শ্যেন দৃষ্টি। অবশেষে দোকানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল সে। একদিন দোকানে না এলে মাদাম রাকুঁয়া ব্যাকুল হয়ে খোঁজেন চারিপাশ। হতাশা মলিন থেরেসার নুখোমুখী একা বসতে যেন তিনি ভীত হয়ে পড়েন মনে মনে। মাঝে মাঝে সেও ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে যেন থেরেসার হাবভাবে। দোকানের একপাশে মাদামকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলে, "হয়ত ওকে বাঁচানো যাবে না আর।" চোখে জল ছলছলিয়ে উঠে তখন লরাঁর। "নিশ্চয়ই খুব বড় কোন অসুখ করেছে ওর। সত্যি, কি যে কপালে আছে আমাদের।"

ক্ষিপ্ন মনে মাদাম রাকুঁয়া শুনতেন সব কিছু। ক্যামিলাসের নাম নিতেও কুণ্ঠা হত না লরাঁর।

"বেচারা বন্ধুর মৃত্যুর দাগা সামলাতে পারেনি ও। এখনো ক্যামিলাসের মরার পর তু বছর ধরে ধিকি ধিকি করে পুড়ছে ও তুষের আগুণে। কার সাধ্য ওকে সান্ত্বনা দেয়।"

এই নির্লজ্জ মিথ্যা কথায় বৃদ্ধার বুক ফেটে কান্না বেরোত। সন্তানের স্মৃতি নতুন করে পাগল করে তুলত তাঁকে। ক্যামিলাসের নাম উঠতেই ফুঁপিয়ে উঠতেন তিনি। যার মুখেই শুনতেন ছেলের নাম তু হাতে তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে চাইতেন আপন মনে। বৃদ্ধার মনের অবস্থা লরাঁ খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিল বলেই কথোপকথনের মধ্যে প্রায়ই গুণকীর্তন করত ক্যামিলাসের। বন্ধুর গল্প করতে করতে যদি থেরেসার চোখে চোখ পড়ত ত চমকে উঠত সে মনে মনে। তখন কেন যেন সত্যি বলেই মনে হত ঐ-সব কথা। তুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন যে বলে যেত মৃত ক্যামিলাসের কথা। মাদাম রাকুঁয়ার কান্না থামত না সারাক্ষণ। অশ্রু সজল চোখে তরুণের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন নিজের সন্তান বলে।

এক বিষ্যুৎবারের সন্ধ্যেয় মিশ' ও গ্রীভে যখন খাবার ঘরে এসে বসেছিলেন। লরাঁও ঘরে ঢুকে থেরেসার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সে কেমন আছে। পরিচিত বন্ধুর মত তার পাশে একটু বসলও সে। তরুণ-তরুণীকে পাশাপাশি বসে' গল্প করতে দেখে মিশ' মাদাম রাকুয়াঁর কানে কানে বললেন,

"এই ত। ওর সঙ্গেই ত আপনার ভাইঝির বিয়ে দিতে পারেন। বলেন ত আমরাও সাহায্য করতে পারি আপনাকে।"

এদের বিয়ে দিলে ভালই হবে বলে মিশ'র মনে হল। থেরেসা যেমন মেয়ে তার সঙ্গে মানানসই গাঁট্টাগোট্টা চেহারা হল লরাঁর। মাদাম রাকুঁয়া, যেন এই প্রস্তাবে অকুলে কুল পেলেন। থেরেসার সঙ্গে লরাঁর বিয়ে দিলে তাঁর অনেক সুবিধে হবে। অপরিচিত জামাই-এর ভয় আর থাকবে না। পরন্তু লরা তাঁর ছেলের শূন্য স্থান কিছুটা পূরণ করতে পারবে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের শয্যাসঙ্গিনী হবার চেয়ে লরাঁর শয্যাসঙ্গিনী হলে থেরেসাও ক্যামিলাসের স্মৃতির প্রতি কম অবমাননা করবে! অপরিচিতের সামান্য চুম্বনের দৃশ্যেই তাঁর বুক ফেটে গেলও পুত্রের বন্ধুর অঙ্কশায়িনী হতে দেবার প্রস্তাবে তিনি আপত্তি করতে পারলেন না। এমনি অদ্ভুত মানুষের মন।

তারপর থেকে যতক্ষণ খেলা চলল বৃদ্ধা একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন থেরেসা আর লরাঁকে। তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে প্রেমিক যুগলের বুঝতে বাকী রইল না যে তাদের অভিনয়ের ফল ফলেছে। বাড়ী ফেরার পথে মিশ' মাদাম রাকুঁয়ার সঙ্গে নীচু গলায় একটু কথা বলেই গম্ভীরভাবে লরাঁর হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন পথে। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসবার সময় লরাঁ চাইল থেরেসার দিকে—দৃষ্টিতে তার ক্ষুরধার সাবধান বাণী।

মিশ' তাকে ডেকে আনলেন বিয়ের ব্যাপারে মতামত জানতে।

মহিলা দুজনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত বলে মনে হলেও লরঁা যেন বিয়ের কথায় আকাশ থেকে পড়ল। বাষ্পাকুল কণ্ঠে লরঁা বলল যে, সে বন্ধুর স্ত্রীকে আপন বোনের মতই ভালবাসে। কিন্তু তাকে বিয়ে করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এত বড় অনাচার সহ্য হবে না তার। প্রাক্তন পুলিশের কর্তাও ততই জেদ করতে লাগলেন। নানা যুক্তি দেখিয়ে মত করানোর চেষ্টা করলেন লরঁার। শেষ পর্যন্ত তিনি এও বললেন যে লরঁার কর্তব্য হচ্ছে মাদাম রাকুয়ার সন্তানের ও থেরেসার স্বামীর শূন্য স্থান পূরণ করা। ক্রমে ক্রমে লরঁা যেন অভিভূত হল তাঁর যুক্তি জালে। এমন ভাণ দেখাল যে শুধু মাত্র কর্তব্যের খাতিরেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত দিচ্ছে এ-বিয়েয়। লরঁার মত আদায় করে মনে মনে নেচে উঠলেন মিশ'—আবার তাহলে তাঁরা আনন্দের মুখ দেখবেন বিষ্যুৎবারের আসরে।

মিশ' যখন ব্যস্ত ছিলেন লরঁাকে নিয়ে, মাদাম রাকুয়াও ঠিক ঐ কথাই আলোচনা করছিলেন থেরেসার সঙ্গে। বিশুষ্ক মুখে ক্লান্ত গতি থেরেসা আসর থেকে উঠতে গেলেই পিসী তাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন। তারপর আদর করে কত কথা জিজ্ঞেস করলেন। সত্যি করে বলতে বললেন কেন সে এমন মন-মরা হয়ে থাকে সব সময়—কেন তার মুখে হাসি দেখা যায় না কখনো! তাঁর প্রশ্নের ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বৃদ্ধা সোজাসুজি উত্থাপন করলেন প্রস্তাবটি—তার কি সত্যি কখনো বিয়ে করার ইচ্ছে জাগেনি মনে? থেরেসা এ প্রশ্নে মর্মাহতের ভাণ করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। চিরজীবন সে বহন করে বেড়াবে ক্যামিলাসের স্মৃতি। মাদাম রাকুয়া আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে অনুযোগ করলেন তার বৈধব্যের অবসান ঘটানোর জন্য। উত্থাপন করলেন লরঁার কথা। লরঁার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে শেষ জীবন কত সুখে কাটাবেন বলে স্বপ্ন

রচনা করেছেন তিনি—সে কথাও শোনালেন তাকে। থেরেসা মনোযোগ দিয়ে তাঁর সব কথা শুনে বলল,

"তা কি করে হয়? আমি যে লরঁাকে ভাই-এর মত ভালবাসি। ভেবেছিলাম কিছুদিন নিজের মনে কাঁদতে পারব। তা যখন আপনার ইচ্ছে নয় তখন যা বলেন তাই করব। লরঁাকেই তাহলে চেষ্টা করব স্বামীর মত ভালবাসতে···· ।"

এই বলে সে বৃদ্ধাকে চুমু খেয়ে চলে গেল। শুতে যাবার সময় মাদাম রাকুয়ঁার গভীর অনুশোচনা হল, কি করে তিনি এত শীগ্‌গীর ভুলে গেলেন তাঁর ছেলের কথা!

পরদিন সকালে পাসাজ-এর দোকানের সামনে বৃদ্ধ মিশঁ ও তাঁর বন্ধু মাদাম রাকুয়ঁার মধ্যে কথা হল কিছুক্ষণ। বিয়ের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলবার পরামর্শ করলেন তাঁরা। ঠিক করলেন সেই সন্ধ্যেতেই বাগদান পর্ব শেষ করে ফেলবেন।

সেদিন বিকেলে পাঁচটার সময় দোকানে এসেই লরঁা দেখল মিশঁকে। তরুণটি চেয়ারে গিয়ে বসলেই তার কানে কানে গিয়ে তিনি বললেন—"ওর মত হয়েছে।"

ছোট্ট ঘোষণাটি থেরেসার কানেও গেল। সে বিবর্ণ মুখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লরঁার মুখের দিকে। প্রেমিক-যুগল এমনিভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। লরঁা ওঠে গিয়ে মাদাম রাকুয়ঁার হাত দুটি জড়িয়ে ধরা-গলায় বলতে লাগল,

"মা, কাল শ্রীযুক্ত মিশঁর সঙ্গে আপনাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আপনারা যাতে সুখী হন আমরা তাই করতে রাজী।"

বৃদ্ধা অতিকষ্টে অশ্রু দমন করে ভাইঝির হাত দুটি এনে লরঁার হাতে দিয়ে দিলেন। একটি কথাও বেরোল না তাঁর মুখ দিয়ে।

সেই স্পর্শে শিহরণ জাগল প্রেমিক-যুগলের সারা অঙ্গে। হাত

ধরাধরি করে তারা এমনি বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে তরুণটি তখন থেরেসাকে লক্ষ্য করে বলল,

"থেরেসা তুমি কি সত্যি তোমার পিসীর শেষ জীবন সুখী করতে চাও?"

"হ্যাঁ", উত্তর দিল সে। "সেটা ত আমাদের কর্তব্যই।"

লরাঁ তখন মাদাম রাকুয়াঁর দিকে ফিরে বলল,

"জলে ডোবার শেষ মুহূর্তেও ক্যামিলাস আমায় বলে গেছে—'থেরেসাকে বাঁচিও—তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম তাকে।' মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করে ক্যামিলাসের শেষ ইচ্ছাই পূরণ করছি যেন আমি।"

একথা কানে যেতেই তীব্র ব্যথার আঘাতে থেরেসা হাত ছেড়ে দিল লরাঁর। প্রণয়ীর স্পর্ধায় হতচকিত হয়ে গেল সে। নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল প্রেমিকের দিকে—আর কান্নার ফাঁকে ফাঁকে মাদাম রাকুয়াঁ বলে চলেছেন, "ঠিক বলেছ—তুমিই ওকে বিয়ে কর—পরলোক থেকে আমার ছেলে তোমাদের করবে শুভ কামনা।"

অবসন্ন ভাবে লরাঁ একটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। মিশঁ এগিয়ে এসে তাকে বললেন, "যাও ওকে চুমু খেয়ে এস—আজই তোমাদের বাগদান পর্ব শেষ হয়ে যাক।"

বিধবার কপোলদেশে চুম্বনের রেখা আঁকতে গিয়ে তরুণের ভীষণ অসোয়াস্তি লাগল মনে। প্রণয়িণীও উঠল চমকে। প্রকাশ্যে এই প্রথম চুমু খেল তার প্রণয়ী তাকে। দেহের সমস্ত রক্ত এক ঝলকে উঠে এল মুখে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সারা চোখমুখ। অথচ এই থেরেসারই কি ছিল লজ্জার কোন বালাই তার অবৈধ প্রেমলীলায়?

সংকট মুহূর্ত পেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল হত্যাকারীদের। অবশেষে তাদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। সেই সঙ্গেই সমস্ত কিছুর বন্দোবস্তও হয়ে গেল। পরের বিষ্যুৎবার তাদের বিয়ের

কথা গ্রীভে, অলিভিয়ের ও তার স্ত্রীকে জানান হল। এ প্রস্তাবের সমস্ত কৃতিত্ব নিজে নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন তিনি এই সংবাদ। বললেন, "দেখো কেমন সুখী হয় এরা।"

সুজান নীরবে চুমু খেল থেরেসাকে। ক্ষীণপ্রাণ নির্জীব বেচারীর কেমন মায়া বসে গিয়েছিল সদ্য বিধবা তরুণীটির উপর। সে সত্যি ভালবাসে থেরেসাকে। অলিভিয়ের পিসী-ভাইঝি দুজনকেই সম্বর্ধনা জানাল। গ্রীভে যৎসামান্য রসিকতাও করেন সেই ফাঁকে।

থেরেসা ও লরঁার হাবভাব ছিল একান্ত গম্ভীর। মুখ দেখে কারুর বোঝবার সাধ্য ছিল না—তাদের মনে কি বাসনার বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

দু-একটি সামাজিক কাজ তখনও বাকী ছিল। বাবার কাছে চিঠি লিখে তাঁর সম্মতি আনতে হল লরঁাকে। জুফোস-এর বৃদ্ধ কৃষক এতদিন ভুলেই গেছিলেন যে তাঁর কোনও ছেলে ছিল কোন দিন। ছেলে গোল্লায় যাক—কি জাহান্নমে যাক—তাঁর কিছুই যায় আসে না। সে যেন তাঁর এক সু বিষয়-আশয়েরও প্রত্যাশা না রাখে কোনও দিন—একথা জানিয়ে দিলেন স্পষ্ট ভাষায়। বাবার এ সম্মতি-পত্রে খুব খুসী হতে পারল না লরঁা।

লরঁার বাবার ঐ কড়া চিঠির ফল হল কিন্তু মাদাম 'রাকুঁয়ার উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তাঁর শেষ সম্বল ঐ চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ যৌতুক দিয়ে বসলেন ভাইঝিকে। নিজের বলতে কিছুই রাখলেন না কাছে।

এবার সবাই উঠে-পড়ে লাগলেন বিয়ের বাজার করতে। সব ব্যবস্থাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারা হল। সকলেই চাচ্ছিলেন কত তাড়াতাড়ি লরঁা পাণি গ্রহণ করবে থেরেসার।

অবশেষে এল সেই অতি প্রত্যাশিত দিনটি।

উনিশ

একই কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন ঘুম ভাঙল লরঁা ও থেরেসার। তাদের বিভীষিকার রাত বোধহয় গেল কেটে। আর একা একা শুয়ে ভয়ে-ভীতিতে রাত জাগতে হবে না তাদের।

থেরেসা ইতস্ততঃ তাকিয়ে মনে মনে হিসেব করল তার বিছানার দৈর্ঘ ও প্রস্থের পরিমাপ। ধীরে ধীরে সাজগোজ করে সে সুজানের অপেক্ষা করতে লাগল। সে এসে তাকে বিয়ের সাজে সাজিয়ে দেবে।

লরঁা বিছানায় উঠে বসল। কয়েক মিনিট একভাবে বসে বসে শেষ বিদায় নিল তার এতকালের আশ্রয় সেই চিলে কুঠরীরের কাছে। এতদিনে নিজের বলবার মত একজন মেয়েকে সে পাবে। তখন ডিসেম্বর। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। বিছানা থেকে নামবার সময় মনে হল যে রাতে আর তাকে কষ্ট করতে হবে না এমন। থেরেসার দেহের উত্তাপে তার শীত যাবে কেটে।

কয়েক দিন আগেই টাকাপয়সার টানাটানির কথা ভেবে মাদাম রাকুঁয়া পাঁচশো ফ্রাঁ গুঁজে দিয়েছিলেন তার হাতে। কোন আপত্তি না করেই তরুণটি সে দান গ্রহণ করে। তা দিয়ে সে কিনল ফিটফাট এক জোড়া নতুন সুট। সেই বৃদ্ধার পয়সাতেই কিছু উপহারও দিল থেরেসাকে।

ইউ ডি কলোনের সুরভি গায়ে মেখে সে ব্যস্ত হল চটকদার প্রসাধনের প্রচেষ্টায়। সার্টের কড়া কলার বাঁধতে গিয়ে যেই হাত পড়েছে সেই ঘা'র উপরে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্যামিলাসের শেষ কামড়ের দৃশ্য। লরঁার হাত পা অবশ হয়ে এল। সেই কলার ফেলে দিয়ে আর একটি কলার পরে প্রসাধন শেষ করল কোনও রকমে। তারপর একটি গাড়ী ডেকে চলল থেরেসাকে নিয়ে গির্জেয়। পথে অরলাঁ্যা কোম্পানীর এক সহকর্মী ও মিশঁকে নিল তুলে। এঁরা

হবেন বিবাহের সাক্ষী। দোকানে এসে তাঁরা দেখলেন কনের দলও প্রস্তুত। গ্রীভে ও অলিভিয়ের হল থেরেসার সাক্ষী। তাদের সঙ্গে আছে সুজান। মাদাম রাকুঁয়াও যেতে চাইলেন তাঁদের সঙ্গে। তাকে ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে সবাই রওনা হলেন গির্জ্জার দিকে।

বিয়ের পর্ব বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গেই সমাপ্ত হল। এমন কি গ্রীভেও অভিভূত না হয়ে পারেন নি বর কনের চালচলনে। তারা কিন্তু ছিল স্বপ্নের ঘোরে। পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসবার সময় নিজের অজান্তেই তাদের মন চঞ্চল হয়ে উঠছিল ব্যথা বেদনায়। কেউ তাকাতে পারছিল না কারুর দিকে। ফিরে গাড়ীতে উঠবার সময় মনে হল বহু দূর সরে এসেছে তারা।

ফেরবার পথে প্রস্তাব হল নমোনমো করে বিয়ের ভোজ শেষ করা হবে বেল-ভিল পাহাড়ের গায়ের কোন এক রেস্তরাঁয়। নিমন্ত্রিতের মধ্যে ছিলেন মাত্র গ্রীভে ও মিশঁরা। সময় কাটানোর জন্য আগাগোড়া বুল ভার্দে বেড়িয়ে বেড়ালেন তাঁরা ছটা পর্যন্ত। তারপর গেলেন রেস্তরাঁয় খেতে।

খাবার ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিল না। দম্পতিদের দেখাচ্ছিল গম্ভীর ও চিন্তাকুল। সকাল থেকেই নানা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল তাদের। কেউ তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেনি তার স্বরূপ। বিয়ের সামাজিকতা রক্ষা করতে করতে হাঁফিয়ে উঠল তারা! খেতে আসবার সময় আর তাদের পা চলতে চাচ্ছিল না।

দুজনে মুখোমুখী বসে যন্ত্রের মত খেতে লাগল তারা। উভয়ের অবসন্ন মনে একই চিন্তাধারার আনাগোনা। তাদের সদ্য বিয়ে হল অথচ কোন নতুনত্বের আস্বাদ পাচ্ছে না তারা এতে। গভীর অতলস্পর্শী খাদের ব্যবধান যেন ভুলতে পারছিল না তারা। তারপর যখন হঠাৎ মনে হল আজ রাতে তাদের শয্যা হবে একত্র দুজনেই উঠল চমকে সে

ভাবনায়। তাদের জীবন যে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে সে অনুভূতি জাগেনি তখনো চেতনায়।

অতিথিরা হাসতে হাসতে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' বলতে অনুরোধ জানালেন। তারা আমতা আমতা করতে লাগল, লজ্জায় লাল হয়ে উঠল দুজনে। অন্যের চোখের সমুখে প্রণয়ীর অভিনয় করতে পারছিল না তারা। অপেক্ষমান মুহূর্তগুলিতে কোথায় উবে গেছে তাদের কামনা-বাসনা। সমস্ত অতীত যেন মিলিয়ে গেছে বিস্তৃতির অতলে। যৌন বুভুক্ষার তীব্রতার লেশ মাত্র নেই তাদের অবশিষ্ট—এমন কি ভোজের আনন্দের রেশও গেছে হারিয়ে। ব্যাকুল, পরিশ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছিল কি ঘটছে তাদের চারিদিকে—সবই যেন অবিশ্বাস্য, অনধিগম্য তাদের কাছে। নীরবে বসে রইল তারা সেখানে। আশা প্রত্যাশা কিছুই ছিল না কারুর।

কড়া কলারের চাপে ঘাড় ফেরাতে গেলেই লরাঁর ঘাড়ের কামড়ের ঘায়ের জায়গায় বেদনা লাগছিল। গির্জেয় মন্ত্র পড়বার সময়ও সে অনুভব করেছে ক্যামিলাসের মরণ-কামড়। থেকে থেকেই মনে হচ্ছিল ক্ষীণ রক্তের ধারা যেন ঘা থেকে চুইয়ে এসে তার ওভারকোট লালে লাল করে দিচ্ছে।

দম্পতিদের গাম্ভীর্যে খুশীই হলেন মাদাম রাকুঁয়া। তা না হলে ভীষণ বেমানান হত যেন এই পরিবেশে তাদের উচ্ছল ব্যবহার। সেই নিষ্প্রাণ উৎসবে প্রাণ দেবার চেষ্টা করছিলেন গ্রীভে। তিনি টোষ্ট প্রস্তাব করলেন,

"আমাদের তরুণ দম্পতিদের সন্তানসন্ততির শুভ কামনায় এবার টোষ্ট পান করতে হবে।" দম্পতি যুগলের মেরুদণ্ড বেয়ে ভীতির শিহরণ এল নেমে। তাদের সন্তানসন্ততি! গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল তারা পরস্পরের দিকে।

খাবার শেষ হতে বেশী দেরী হল না। অতিথিরা জোর করে বাসর ঘরে পর্যন্ত এলেন। পাসাজ-এর দোকানে যখন এসে পৌঁছালেন তখন সবে নটা বেজেছে। নকল জহরত বিক্রয়কারিণী তখনও বসেছিলেন পসরা নিয়ে। তিনিও মাথা তুলে অভ্যর্থনা জানালেন নবদম্পতিকে। তারা কিন্তু সে চাহনির সামনে ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়ল। হয়ত সেই বৃদ্ধা এদের অবৈধ প্রণয়ের খবর যে জানে না কে বলতে পারে তা?

মাদাম রাকুঁয়া, সুজানকে নিয়ে থেরেসা তখন তখনি শোবার ঘরে চলে এলো। শোবার জন্যে কনে প্রস্তুত হবার সময়টুকু পুরুষরা রইলেন খাবার ঘরে। গ্রীভে ও মিশঁর সস্তা রসিকতা উপভোগ করতে লাগল লরাঁ। তারপর সুজান ও বৃদ্ধা মাদাম রাকুঁয়া বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বৃদ্ধা বললেন লরাঁকে ডেকে—তার স্ত্রী অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে আহ্বানে চমকে উঠল লরাঁ। মাতালের মত টলতে টলতে কোনও রকমে সে এসে ঢুকল থেরেসার ঘরে।

কুড়ি

ঘরে ঢুকে লরাঁ দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দেখল ঘরের ভেতরটা। বড় অসোয়াস্তি লাগছিল তার।

অগ্নিকুণ্ডে ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন। তার আভা গিয়ে লাগছে ছাদে ও দেয়ালে। সেই স্তিমিত আলোর ছটায় ঘরের অন্ধকার গেছে কেটে; তুলনায় টেবিলের ওপরের বাতিদানের বাতিটার আভাও দেখাচ্ছে ম্লান। মাদাম রাকুঁয়া ঘরটিকে বেশ মনোরম করে সাজাতে চেয়েছিলেন। তাই সাদায় সাদা আর সৌরভে ভরা ছিল ঘরখানি—ঠিক তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার কাকলিকুজনের নীড় যেন। বিছানা ঢেকে দিয়েছেন লেস দিয়ে—ম্যান্টলপিসের ফুলদানিতে রেখেছেন থোলো থোলো ফুটন্ত

গোলাপ। সুরভিমদির কবোষ্ণ পরিবেশের গভীর প্রশান্তি মাতাল করে তোলে প্রণয়-লীলাভিরামের নেশায়। কম্প্রমান নীরবতা ভাঙছে শুধু অগ্নিকুণ্ডের ফিস্‌ফিসানী। প্রেমিক-প্রেমিকার এমন মিলন-বাসর বুঝি আর হয় না।

অগ্নিকুণ্ডের ডান পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছে থেরেসা। গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল অগ্নিশিখার দিকে। লরঁাকে ঢুকতে দেখে সে মাথা ফেরাল না। পেটিকোট ও ড্রেসিং-জ্যাকেটে তাকে দেখাচ্ছিল তুহিন-শুভ্র। জ্যাকেট কখনো একটু আল্গা হয়ে পড়ায় কাঁধের গোলাপী আভা ফুটে বেরোচ্ছিল কালো চুলের রাশির ফাঁকে ফাঁকে।

কোন কথা না বলে লঁরা এগিয়ে এল কয়েক পা। কোট ওয়েষ্টকোট খুলে রেখে খালি সার্ট গায়ে দিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল থেরেসাকে। সে নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ হল তার। তখন হঠাৎ নজরে পড়ল কঁাধের সেই উন্মুক্ত অংশটুকু। শিহরিত আবেগে সে এগিয়ে গেল সেখানে চুমু খেতে। আচম্‌কা এক ঝটকায় তরুণী ঘাড় সরিয়ে নিল। লরঁার প্রতি এমন এক অপরিচিত বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে যে লরঁা পিছিয়ে এল চলে। দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে উঠল সেও।

থেরেসার মুখোমুখী আগুনের আর এক পাশে বসল লরঁা। ওরকম নির্বাক নিস্তব্ধতায় বসে রইল তারা দীর্ঘ পাঁচমিনিট কাল।

প্রায় দুবছর পর অন্যের চোখের আড়ালে প্রেমিক যুগলের মিলন হল আজ। রু সঁা বিক্তর-এ গিয়ে থেরেসা যে-দিন তার মাথায় খুনের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে কামানলে আত্মাহুতি দেবার এমন সুযোগ আর তারা পায়নি কখনো। এতদিন বিচার বিবেচনার জন্য দৈহিক মিলনে ছিল বাধা। শুধুমাত্র হস্তসংশ্লেষ কি চুম্বনেই থাকতে হয়েছিল তৃপ্ত। ক্যামিলাস হত্যার পর যখনই তাদের রক্তে লেগেছিল কামনার

আগুন তারা মনকে প্রবোধ দিয়েছিল বাসর রাত্রির অপেক্ষায়। অবশেষে সেই বাসর রাত যে-দিন এল তারা বসে রইল মুখোমুখী—অকস্মাৎ এক অব্যক্ত অস্বস্তি গ্রাস করেছে তাদের। শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেই আলিঙ্গনের নির্মম পেষণে পীড়িত করতে পারে প্রণয়ীযুগল। অথচ হাত পা তাদের কেমন অবশ হয়ে পড়েছে—যেন ক্লান্তরতি অবসন্ন তারা। তাদের প্রজ্জ্বলিত কামনা বহ্নির পরিসমাপ্তি ঘটেছে রোমহর্ষক বাস্তবতায়। ক্যামিলাস নিহত হয়েছে, তাদেরও বিয়ে হয়েছে নির্বিঘ্নে; অথচ লরাঁর অধোরোষ্ঠের স্পর্শে তড়িত স্পৃষ্টের মত সরে দাঁড়িয়েছে থেরেসা। তাদের কামনার আকুতির রূপান্তর ঘটেছে বিতৃষ্ণায়।

অতীতে যে বাসনাবহ্নিতে জ্বলে পুড়ে মরেছে তারা তারই ভগ্নাবশেষ খুঁজতে লাগল মরিয়া হয়ে। মাংস পেশী কিংবা স্নায়ু গ্রন্থির কোন অস্তিত্বই নেই তাদের শরীরে। প্রেমাভিনয়ে অসামর্থ্যের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের উপর অসীম বিরক্তিও প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের। ধিক্কার দিচ্ছিল তারা নিজেদের।

অবশেষে লরাঁ শুরু করল অতীত প্রেমের স্মৃতি মন্থন। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে লরাঁ জিজ্ঞেস করল,

"মনে পড়ে থেরেসা এই ঘরে যখন বিকেলে আসতাম আমরা?........ ঐ দরজা দিয়ে ঢুকতাম........আর আজ এসেছি সদর দিয়ে....আজ আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না এখন আমাদের প্রেমের।"

লরাঁর স্বরে প্রাণের পরশ নেই। নীচু চেয়ারে গুড়িগুড়ি মেরে তরুণী তখনো সেই একই ভাবে বসে শুনল তার যন্ত্রের মত কথাগুলো।

"মনে পড়ে?" আবারও রেশ ধরল লরাঁ, "আমি স্বপ্ন দেখতাম সারারাত কাটাবো তোমায় নিয়ে; তোমারই কোলে ঘুমিয়ে পড়ব, আবার উঠব জেগে তোমারই চুমুতে। আজ আমার সেই সাধ পূরণ হবে...."

চমকিত থেরেসা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে। এদিকে লরঁা বলে চলেছে, "এতদিনে আমাদের স্বপ্ন হয়েছে সফল, থেরেসা। সমস্ত বাধা বন্ধন ডিঙিয়ে আজ আমরা একান্তভাবে আপনার····এখন ভবিষ্যৎ হল আমাদেরই হাতে····শান্তির জীবন, সুখের জীবন গড়ে তুলতে চাই আমরা, ক্যামিলাস আর নেই·······"

লরঁা থামল। ক্যামিলাসের নাম উচ্চারণেই শিউরে উঠল থেরেসা। কম্পিত বক্ষে হত্যাকারীরা চেয়ে রইল হত বিহ্বল হয়ে পরস্পরের দিকে। ঐ নামের উল্লেখ করা মাত্রই আবার তার প্রেতাত্মা এসে ভর করল তাদের কাঁধে। দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল দুজনেই।

এই অসহ্য অবস্থার হাত থেকে বাঁচবার জন্য লরঁা হঠাৎ উঠে পায়চারী করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। তারপরে থেরেসার পাশে বসে টুকিটাকী গল্প করতে আরম্ভ করল যেন কিছুই হয়নি।

থেরেসা বেশ বুঝতে পারল তার মনোভাব। প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টাও করল মাঝে মাঝে। জোর করে সহজ সাবলীল কথোপকথন শুরু করতে চাইল তারা। তবু মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারল না কি যেন লুকোচ্ছে তারা মনের গভীরে। যত চেষ্টাই করুক না কেন ক্যামিলাসের ছবি মুছছিল না তাদের মন থেকে।

অবশেষে থাকতে না পেরে থেরেসা বলে উঠল,

"তুমি তার লাস দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ।" ধরা গলায় উত্তর দিল লরঁা।

আবার শিউরে উঠল হত্যাকারীরা। ঘন হয়ে বসল আগুনের ধারে।

"খুব কষ্ট হয়েছিল বলে কি মনে হল?"

লরঁা উত্তর দিতে পারল না। ব্যর্থ চেষ্টা করে উঠে পড়ল সে। বিছানার দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ ফিরেই গলা বাড়িয়ে দিল থেরেসার দিকে। বলল,

"চুমু খাও, লক্ষ্মীটি একবার।"

থেরেসাও উঠেছে। রাত কামিজের ভাঁজে দেখা যাচ্ছে বিবর্ণ দেহ তার। সে মুখ সরিয়ে নিল দূরে। লরাঁর গলার ঘায়ের দাগের দিকে এই প্রথম নজর পড়ল তার।

"চুমু খাও, চুমু খাও বলছি"—লরাঁর স্বরে ব্যগ্র আকুতি। তরুণী মুখ ফিরিয়ে নিল আরও দূরে। তার গলায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

"এ দাগ ত দেখিনি তোমার আগে—কি হয়েছিল এখানে?"

"এটা........এটা"........আমতা আমতা করল লরাঁ—"এখানেই ত ক্যামিলাস কামড়ে দিয়েছিল ডোববার আগে। এখন আর কিছু নেই.... সব ঠিক হয়ে গেছে। কই, চুমু খেলে না—চুমু খাও—চুমু খাওনা বলছি।"

জ্বলন্ত গলা বাড়িয়ে দিল পিশাচ লরাঁ থেরেসার দিকে। ভেবেছিল সেই জ্বলন্ত দাগে তার চুম্বনের প্রলেপে হয়ত একটু শান্তি পাবে সে।

থেরেসা তখনও সরে আসছে। কাতরভাবে বলছে—"ওগো না, ওখানে নয়—ওখানে যে রক্ত জমে উঠেছে!"

কাঁপতে কাঁপতে নীচু চেয়ারটায় বসে পড়ল সে আবার। লরাঁ হতভম্ব। ঘাড় নীচু করে অনিশ্চিত আগ্রহে তাকিয়ে রইল থেরেসার দিকে। তারপর হঠাৎ জন্তুর মত বীভৎস আকর্ষণে টেনে নিল তাকে নিজের বুকে। মুখখানা দুহাতে ধরে ঘসে দিল সেই জায়গায়। মুহূর্তের জন্য তরুণীর কমনীয় মুখ চেপে ধরল সে নিজের দেহে। থেরেসা কাঠ হয়ে গিয়েছে সেই জান্তব আকর্ষণে। কোনও রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে মুখ মুছে থুথু ফেলল আগুনের কুণ্ডে।

এতক্ষণে নিজের পাশবিকতায় লজ্জা হল লরাঁর। যে-চুম্বন সে জোর করে আদায় করল—মুহূর্তেই তা গেল এত বিষিয়ে যে তার মনে হল জীবনেও সে কখনো ভালবাসেনি থেরেসাকে—কিংবা থেরেসাও ভালবাসেনি তাকে। ঘণ্টা খানেক ধরে তার দিকে পেছন ফিরে থেরেসা

বসে রইল এক ভাবে—আর লরাঁ করল ঘরময় পায়চারী। উভয়েই স্পষ্ট বুঝতে পারল—আগের সেই উদগ্র কামনার ঘটেছে সমাধি লাভ। ক্যামিলাসকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই টুঁটি টিপে মেরেছে নিজেদেরও কামপ্রবৃত্তি।

ধিকি ধিকি করে আগুন জ্বলছে, ক্রমেই ঘরের বদ্ধ পরিবেশের গরমে দম আটকে আসছে তাদের।

হঠাৎ তড়িতস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল লরাঁ। সে যেন প্রত্যক্ষ করছে ক্যামিলাসকে। আগুনের চুল্লী ও আলনার মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যামিলাস, লাসঘরে যেমন দেখেছিল—ঠিক সেই মূর্তিতে এসেছে সে। চেয়ারের হাতল ধরে চলৎশক্তি রহিত অর্ধমূর্ছিত অবস্থায় লরাঁ রইল দাঁড়িয়ে। মুখ দিয়ে আতংকের চাপা গোঙানী বেরিয়ে এল শুধু। সেই গোঙানীর শব্দে মাথা তুলে তাকাল থেরেসা।

"ঐ দেখ, ঐ দেখ—" ভীতি ব্যাকুল কণ্ঠে বলল লরাঁ! তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ঘরের কোণায় ক্যামিলাসের ক্রূর মূর্তি যেখানে দেখা যাচ্ছিল সে-দিকে। ভীতচকিত থেরেসা তার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। ফিসফিসিয়ে বলল, "এটা তার ছবি।" পাছে তার স্বামীর কাণে ওঠে তাই যেন ভয়ে গলা দিয়ে স্বর ফুটে বেরুচ্ছে না তার।

"তার ছবি ?"—লরাঁর চুল খাড়া হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

"হ্যাঁ, তোমার মনে নেই—তুমি যে এ-ছবিটা একে দিয়েছিলে সেই কবে। পিসীর এটা নামিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল। হয়ত ভুলে গেছেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারই ত ছবি ওটা...."

মানসিক চাঞ্চল্যের ফলে এতক্ষণ সে ঠাহরই করতে পারেনি যে এটা তারই আঁকা ছবি। যে-ভয়াল মুখের বিকার দেখে আজ সে শিউরে উঠছে—সেটা যে তারই অপটু হাতের আঁকা—তা যেন

আর মনে পড়ছে না। কিছুক্ষণ লাগল তার দম নিতে। তারপর থেরেসাকে বলল,

"যাও ছবিটা নামিয়ে রাখ।"

"আমি পারব না, আমার ভয় করছে।" শরীর কাঁপছে তার। লরঁারও কাঁপন ধরল আবার নতুন করে। সে কাতর মিনতি জানাল স্ত্রীকে,

"যাও যাও, লক্ষীটি, নামিয়ে আন গিয়ে।"

"না, না।"

"তাহলে ছবির মুখটা ঘুরিয়ে রাখ, আমাদের আর ভয় লাগবে না।"

"না, তাও পারব না।"

ভীরু কাপুরুষের মত লরঁা ঠেলে এগিয়ে দিল থেরেসাকে। ইচ্ছে নিজে লুকিয়ে থাকে তার আড়ালে। কিন্তু থেরেসা কিছুতেই রাজী হল না। সে পালিয়ে গেল দূরে। তখন লরঁা নিজেই এগিয়ে গেল। কিন্তু তারও সাহসে কুলোল না সেই ছবি স্পর্শ করতে। সে পিছিয়ে এল,

"থাকগে, তোমার কথাই ঠিক। পিসিমাই এটা নামিয়ে নেবেন কাল।"

ঘরের ভেতরের সামান্য অস্বাভাবিক আওয়াজেই চমকে উঠছিল এরা—অভিভূত হয়ে পড়ছিল আতংকে।

হঠাৎ খস্ খস্ শব্দ এলো তাদের কানে। দুজনেই কানপেতে শুনলো কোথা থেকে আসছে আওয়াজটা, তারপর প্রায় মিনিট পাঁচেক দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল ভয়ে কাঠ হয়ে—এই বুঝি ক্যামিলাসের প্রেতাত্মা ঢুকল ঘরে। এমন সময় করুণ মিউ মিউ শব্দে ভাঙল তাদের ভয়।

আবাব চলল লরঁার পদচারণা। ভোরের অপেক্ষায় রইল তারা দুজনে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। শুতে যাবার কথাও মনে উঠল না কারুর।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত ম্লান প্রভাতী আলোর স্তিমিত রেখা দেখা গেল বাইরে। সেই আলোয় ফিরে এল আবার সাহস ও ধৈর্য। সে সকলের আগে নামিয়ে আনল ক্যামিলাসের ছবি। থেরেসা বিছানার চাদর মুচড়িয়ে, এলোমেলো করে রাখল সবকিছু....

তারপর লরাঁ বলল, "আজ রাতে আমরা নির্বিঘ্নে ঘুমোব। এ ছেলে-মানুষী আর কদিন চলবে ?"

গভীর গম্ভীর দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইল থেরেসা।

"এমনি করে জেগে জেগে রাত কাটানোর জন্যই কি বিয়ে করলাম বলতে চাও ? যত সব আবোল তাবোল দুর্ভাবনার কথা বলে তুমিই ত আমার সব কিছু দিলে গুলিয়ে। আজ রাতে দয়া করে হাসিখুশী থেকো আর ভয় দেখিও না আমাকে।" কথা কটি বলেই লরাঁ অকারণে হাসতে লাগলো জোর করে।

"আচ্ছা, দেখবো চেষ্টা করে।" উত্তর দিল তরুণী একান্ত নিস্পৃহ সুরে।

এমনি করে কাটল লরাঁ-থেরেসার প্রথম বিবাহ বাসর।

একুশ

অনুবর্তী রজনীগুলি দেখা দিল আরও মর্মান্তিক হয়ে। হত্যাকারীদের আগে আশা ছিল, একত্র হয়ে আতংকের হাত থেকে বাঁচবে। এখন দেখছে একত্র থেকেও রক্ষে নেই সেই আতংকের হাত থেকে। দুজনে ক্ষেপে উঠেছে; একে অন্যের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে; অসহ্য তাদের পরস্পরের সাহচর্য।

থেরেসার খেয়ালী-মেজাজের বিশিষ্ট ছাপ পড়েছে লরাঁর সাদাসিধে

হাসিখুশী স্বভাবের উপর। অতীতে প্রেমোচ্ছ্বাসের দিনে এরা একে অন্যের পরিপূরক হয়েছে। পুরুষ এনেছে সজীব রক্তের প্লাবন রমণীর কামনার দহে। একের জীবনে সার্থক হয়ে উঠেছিল অপরে। চুম্বন ও প্রেমাভিনয়ের প্রয়োজন ছিল উভয়ের অস্তিত্বের ভিত্তি। এখন ভেঙ্গে পড়েছে সে সম্বন্ধ। থেরেসার খেয়ালী মেজাজের তীব্রতা হচ্ছে খরতর। ঘটনাচক্রের সংঘাতে জীবদেহে কতগুলি পরিবর্ত্তন দেখা দিলে মানুষের মনের উপর তারা কি প্রভাব বিস্তার করে এ নিয়ে আলোচনা করলে বেশ মজার রহস্যের সন্ধান মেলে।

থেরেসার সঙ্গে পরিচয়ের আগে লরাঁ ছিল হাসিখুশী হিসেবী চাষীর ঘরের সাধারণ ছেলে। প্রায় পশুর মতই কাটত তার দিন শুধু খেয়ে, ঘুমিয়ে আর নেশা করে। জীবনে কোনও সমস্যা তাকে পীড়িত করেনি কখনো। বড়জোর স্নায়ুর অতলে অনুভব করেছে যৌন চাঞ্চল্য। এই অনুভূতিগুলিকে তীব্রতর করে তুলেছে থেরেসা। স্থূলকায় লরাঁর মেদবহুল নির্জীব দেহে জাগিয়ে তুলেছে থেরেসা অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রেরণা। এতদিন লরাঁ জীবনকে উপভোগ করে এসেছে রক্তের অনুতে অনুতে; আর আজ স্নায়ুর শিহরণে জাগে তার জীবনবোধ। ফলে যৌনানুভূতির তীব্রতা বেড়ে গেছে বহুগুণ থেরেসার প্রথম চুম্বনের মুহূর্ত থেকেই। তারপর স্নায়ুর পীড়ন গেল বেড়ে—রক্ত প্রবাহ ও স্নায়ুবিক প্রদাহের ভারসাম্যে ঘটল পরিবর্ত্তন। তার স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, হিসেবী মনের সমাধি হল রচিত। মনের এই বিচিত্র গতির ফলেই কাপুরুষ শিশুর মত আঁধার ঘরে ঢুকতে কেঁপে উঠে লরাঁ। অবশেষে অনিবার্যরূপে সে হয়ে পড়েছে অনিদ্রার দাস—এক অভিশপ্ত অসহ্য জীবন গ্রাস করেছে তাকে।

এ যাতনার অভিশাপ বয়ে চলেছে শুধু তার দেহে। লরাঁর বিবেকের দংশন নেই, ক্যামিলাসকে হত্যার জন্য কোনও অনুতাপ নেই তার মনে। দিনের আলোয় রাতের আতংক যেত কেটে—তার মনে হত

থেরেসার পাগলামীর জন্যই তার এই দশা হচ্ছে রোজ রাত্তিরে। সে দোষ দিত থেরেসাকে। থেরেসাই কাঁপছে সারাক্ষণ কিসের ভয় কে জানে! কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার নামবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে জাগে আশংকার ছায়া। হিমশীতল ঘাম জমে ওঠে লরাঁর দেহে। সেও ভয়ে কাঁপতে থাকে ছেলেমানুষের মত। কঠিন ব্যারাম হয়েছে যেন তার।

থেরেসারও কম মানসিক চাঞ্চল্য সহ্য করতে হয়নি। বছর দশেক বয়েস থেকেই তাকে হতে হয়েছে অন্যের খেয়ালের বলি। তুফান জেগেছে তার মনে—সামান্য সুযোগ পেলেই তা ফেটে পড়তে পারত সর্বধ্বংসী ঝটিকাবর্তে। সেই সময় এল লরাঁ। দুর্বার কামনার বীভৎস প্রকাশ পেল তার জীবনে। উদগ্র বাসনা-বিহ্বল লোলুপ আলিঙ্গনের প্রথম মুহূর্ত থেকেই সে মেতে উঠেছে রীরংসায়। কামনা বাসনাই হয়েছে জীবনের চরমতম সার্থকতা। তারই পরম পরিণতি হল এখন। আতংকে মুহ্যমান থেরেসার মনে বিবেকের দংশন অনুভূত হয় মাঝে মাঝেই। এক একবার ভাবে ক্যামিলাসের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা জানায়—করে গভীর অনুশোচনা, প্রায়শ্চিত্তের কৃচ্ছ্রসাধন।

থেরেসার মনের এই বিচিত্র গতির সন্ধান অজানা নয় লরাঁর। তাই তার সামান্য প্রকাশ মাত্রই পাশবিক পীড়নে অবদমিত করে থেরেসার ভাবচাঞ্চল্য।

নব পরিণীতা দম্পতির বিবাহের প্রথম সপ্তাহ কাটল এমনি করে। বিছানায় শোওয়া হল অসম্ভব। তারপর রাত্রি জাগরণের অবসন্নতার ভারে দুজনেই শরীর এলিয়ে দিল বিছানায়—কিন্তু কোথায় ঘুম? দিনের জামা কাপড়ও ছাড়বার সাহস হত না তাদের। যত দূরে সম্ভব থাকত একে অন্যের চেয়ে। দুজনের ভেতর থাকত মৃত ক্যামিলাসের প্রেতাত্মার স্থান।

ক্যামিলাসের প্রেতাত্মার উপস্থিতি অনুভব করত তারা দুজনেই।

লর়াঁর ইচ্ছা হত দুর্বার আলিঙ্গনে পিষ্ট করে থেরেসাকে—কিন্তু সাহস পেত না তাকে স্পর্শ করতে। আতংকে পিছিয়ে আসত মৃতের ঈর্ষার কথা ভেবে।

কালক্রমে মৃদু চুম্বন বিনিময়ের মত স্থৈর্য ফিরে পেল তারা। তরুণটি ঠাট্টা করত স্ত্রীকে, জোর করে আদায় করত তার চুম্বন। কিন্তু বড় নিষ্প্রাণ, বড় শীতল আর ভাবলেশহীন ছিল থেরেসার অধরোষ্ঠ। কোথায় গেল তার উত্তাপ চঞ্চল সেই আকুতিময় কামনার জোয়ার!

একদিন আত্মসম্বরণে অপারগ লর়াঁ ধমকে উঠল,

"জানি, জানি যে তোমার আতংক ক্যামিলাসের জন্যে। বেশ বুঝতে পারি তা আমি। কি বোকা মেয়ে তুমি? এতটুকু সাহস নেই মনে? তুমি কি ভাবো যে প্রথম স্বামী এসে তোমায় হেঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে? একদিন নিয়ে যাব তোমায় তাহলে ক্যামিলাসের কবর দেখাতে। তার কফিন খুলে দেখাব কোথায়, কতদূর চলে গেছে সে—তা হলে ত ঘুচে যাবে তোমার আতংক?"

চাদর মুড়ি দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল থেরেসা লর়াঁর এই পাষাণ অন্তরের পরিচয়ে। তবুও নিস্তার নাই। লর়াঁ বলে চলেছে,

"এ সব ছেলেমানুষী এখন রাখ। ন্যাকামীর আর বয়স নেই তোমার। দয়া করে আমার সুখের পথের কাঁটা হয়ো না।.........এগিয়ে এসো, চুমু খাও আমাকে।" তরুণী সে নির্দেশ অবহেলা করতে পারল না। হিমশীতল হতাশ চুম্বনের রেখা এঁকে দিল কাঁপতে কাঁপতে।

এতক্ষণে লর়াঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, থেরেসার নিরঙ্কুশ বৈধব্য ঘটেনি তখনও। সে বিয়ে করেছে যে মেয়েকে—তার স্বামী সারাক্ষণ জড়িয়ে আছে তাকে। হতভাগ্য ডুবে-মরা স্বামীর রাহু-গ্রাস থেকে মুক্তি পায়নি সে। ক্রমেই লর়াঁ বদ্ধ উন্মাদ হবার উপক্রম হল। প্রথমে

তার ভয় হত। সে থেরেসাকে স্পর্শ করতে পারত না। রাত-কামিজে থেরেসার পাশেই শুত না। তারপর সে-ভয় কেটে গেল। রাগে, দুঃখে, হতাশায় এবার ঠিক করল থেরেসাকে জড়িয়ে থাকবে ঘনালিঙ্গনে। যদি তাতে শান্তি পায় এতটুকু।

তরুণীও তখন হতাশার শেষ সীমায়। লর্ঁার আলিঙ্গনে এলিয়ে দিল নিজেকে! চাইল তার কামনার দাবদাহে নিঃশেষে জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে যাক সকল সমস্যা, সকল শংকা, সকল হতাশা।

তীব্র আকর্ষণে টেনে নিল তারা একে-অন্যকে। কামনার স্থান দখল করেছে তখন ব্যথা ও বেদনা। কিন্তু দেহের অনুতে অনুতে স্পর্শের তড়িত প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল তারা—জ্বলন্ত অঙ্গার কে ছুঁড়ে দিল তাদের গায় যেন! কেঁদে, ককিয়ে উঠল তারা—আরও ঘনালিঙ্গনে জড়ালো নিজেদের। এতটুকু ফাঁক রাখবে না তারা সে-মিলনে। ডুবন্ত ক্যামিলাসের স্থান নাই তাদের আলিঙ্গনে!

নির্মম চুম্বনে ক্ষত-বিক্ষত করল তারা নিজেদের; লর্ঁার ঘাড়ের ঘায়ের মুখে পাগলের মত মুখ ঘসছে থেরেসা। নিজের অন্তরের আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে সে লর্ঁার ক্ষত স্থান, সারিয়ে তুলবে সে ক্ষত। কিন্তু জ্বলছে তার নিজেরই ঠোঁট—কি তীব্র জ্বালায় জ্বলছে সে! ব্যথায় পাগল হয়ে লর্ঁা এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে। থেরেসাও নাছোড়বান্দা। সে খুঁজছে লর্ঁার ক্ষতস্থানটিকেই। কিসের জান্তব আনন্দ মাতাল করেছে তাকে। ক্যামিলাসের কামড়ের ক্ষত স্থানে ঠোঁট ঘষতে বড় ভাল লাগছে তার। মৃত স্বামীকেও যেন কামড়াচ্ছে সে সেখানে। তাই এত জ্বালা!

ক্ষণিকের বিরতি এল। যতই বিরক্তিতে ঘটছে পরিসমাপ্তি প্রতিটি

আলিঙ্গনের ততই নবতর প্রচেষ্টায় পাগল হয়ে উঠছে তারা। কিন্তু সফল হচ্ছে না কোন বারই।

অবশেষে প্রণয়ক্রীড়ার সব আশা ছেড়ে দিল তারা। পরাজয় মেনে এলিয়ে দিল নিজেদের। তাদের কানে বাজতে লাগল নিহত ক্যামিলাসের বিজয়ী অট্টহাস্য!

বাইশ

বৃদ্ধ মিশ' ঠিক যা ভেবেছিলেন, বিয়ের পর থেকে বিষ্যুৎবারের আড্ডার চেহারাই গেল বদলে। বিয়ের পর প্রথম আড্ডায় আসবার সময় গ্রীভে ও মিশ' যেন দেশ জয় করে ফিরলেন। অতীতের আনন্দের দিন গুলো ফিরে এল যেন হাওয়ায় ভর করে।

প্রত্যেক সপ্তাহে আসে বিষ্যুৎবার। আর বিষ্যুৎবারের সন্ধ্যে এলেই সেই পুরানো বিরক্তিকর চেহারাগুলো দেখে ক্ষেপে ওঠে থেরেসা। সে অস্বীকার করে তাদের আড্ডায় যেতে। আসরের অট্টহাস্যে বিরক্তি ধরে তরুণীর। কিন্তু লরঁা তাকে বোঝায়—তা ঠিক নয়। পুলিশকে হাতে রাখা দরকার। তাদের মনে যেন কোন সন্দেহ না জাগে।

কতকটা এই সময় থেকেই দম্পতি-যুগল দুটো বিপরীত জীবন যাপন করতে সুরু করল।

দিনের আলোয় রাতের বিভীষিকা দূর হয়ে গেলে লরঁা তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে নিত। খাবার ঘরে এসে না পৌঁছান পর্যন্ত সে স্বস্তি পেত না। এক বিরাট গেলাস ভর্তি কফি খেত সেখানে বসে তারা। স্মিত হাস্যে মাদাম রাকুঁয়া লক্ষ্য করতেন তাদের প্রাতরাশ। থেরেসা নিজে হাতে করত সব তৈরী। তারপর পেট পুরে টোষ্ট খেয়ে আস্তে

আস্তে ধাতস্থ হত লরাঁ। কফির পর খেত ছোট্ট এক গেলাস ব্র্যাণ্ডি। ব্র্যাণ্ডি খেয়ে, "সন্ধ্যায় আবার দেখা হবে" বলে বেরিয়ে পড়ত অফিসে।

বসন্ত আসছে, জেটির ধারের গাছের চূড়ায় নবীন কিশলয়ে সবুজের জোয়ার ভাসছে। নীচে নদীর কলতান, মাথার উপরে প্রথম অরুণোদয়ের উষ্ণতা।

খোলা হাওয়ায় নিজেকে আবার ফিরে পায় লরাঁ। আলো ঝল্মল্ সীনের পাড় ধরে জেটির কর্মব্যস্ততা দেখতে দেখতে ধীর পদক্ষেপে এগোয় অফিসের দিকে। পেটে অন্নজল পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ধাতস্থ হয়েছে লরাঁ। অফিসে এসে সারাদিন কাটায় হাই তুলে, কখন ছুটি হবে সেই আশায়। দূর ছাই, এ চাকরী আর করব না—ভাবল সে মনে মনে। সে আবার সুরু করবে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস; খুলবে স্টুডিও। অলস জীবন যাপনের নতুন প্রেরণা পেল সে এই চিন্তায়। কিন্তু অফিস ছুটির পর আবার যখন দোকানে ফিরে আসবার সমস্যা দেখা দিল, কাঁটা দিয়ে উঠল তার গা। বিভীষিকার কালো ছায়া বুঝি প্রতীক্ষা করছে তার জন্যে!

থেরেসার মনের গতিও বয়ে চলেছে একই খাদে। লরাঁ কাছে না থাকলেই স্বস্তি লাগে তার। সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকতে পারবে বলে ঝি ছাড়িয়ে দিয়ে নিজের হাতে আরম্ভ করল সব কাজ। ঘরদোর ঝক্ঝকে তক্তকে করে রাখার চেষ্টায় মেতে উঠ্ল সে। কাজ না করলে—পরিশ্রমে অবসন্ন না হলে সে পাগল হয়ে যাবে যে!

ঘরদোর ঝাড়া-মোছা করতে করতে সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে; বাসন মেজে, ঘরের ঝুল ঝেড়ে আর তার অন্য কোন কথা ভাববারই ফুরসৎ হয় না কখনো। তারপর খাবার ঘরে গিয়ে রান্না করার পালা। টেবিলে খেতে বসার পর তাকে বারে বারে ডিস আনতে উঠতে হয় দেখে মাদাম র‍্যাকুয়াঁর বড় কষ্ট লাগে। ভাইঝির কাজের বাড়াবাড়িতে তিনি রীতিমত

দুঃখিত। মৃদু ধমকও দিলেন একদিন। উত্তরে সে জানালো, গতরে খেটে যদি কিছু টাকা বাঁচানো যায় ত মন্দ কি !

খাবার পর সেজেগুজে দুপুরে পিসীর সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসত সে। সেখানে বসে বসে ঘুমে ঢুলত। ঘুম আসত না—তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থাকত চোখ। দেহের স্নায়ুমণ্ডলী, শিরা-উপশিরা যেত শিথিল হয়ে। ক্যামিলাসের বিভীষিকাও মুছে যেত মন থেকে। এটুকু বিশ্রামের অবকাশ না পেলে হয়ত পাগল হয়ে যেত সে—ভেঙে পড়ত এ-সুতীব্র মানসিক সংঘাতে।

কোন খরিদ্দার ঘরে এলেই টের পেত সে। সওদা গুছিয়ে খুব সুন্দর প্যাক করে তার হাতে গুঁজে দিয়েই আবার সুরু করত ঝিমোতে। কখনো কখনো চোখ খুলেও রাখতে হত তাকে। মাঝে মাঝে সুজান আসত দেখা করতে। সারা বিকেল সে বসে থাকত কাউণ্টারে, তার পাশে। অলিভিয়ের-এর সরলা স্ত্রীকে এখন বেশ ভালই লাগে থেরেসার। খুব সৌহৃদ্য গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। আগের সে বিরূপ ভাব আর নেই।

এভাবে বিকেল চারটে পর্যন্ত কাটিয়ে দিত থেরেসা। তারপর আবার আসত হেঁসেলে। তাড়াহুড়ো করে লরাঁর খাবার তৈরী করত তখন। চৌকাঠে স্বামীর ছায়া পড়লেই কিন্তু তার গলা যেত শুকিয়ে—সারা দেহে শুরু হত অব্যক্ত যন্ত্রণা !

এভাবেই কাটছিল উভয়ের দিন। রাতে শীগগীর শুতে যেতে করত ভয়। তাই যতক্ষণ পারে বাইরে বাইরে থাকত দুজনে। বড় আরাম কেদারায় আধ-শোয়া অবস্থায় মাদাম রাকুঁয় পড়ে থাকতেন তাদের মধ্যে। গল্প করতেন ভারনঁর। কিন্তু ভুলেও ছেলের নাম উচ্চারণ করতেন না একটিবার। আবার এই ছেলে-বৌ নিয়ে নতুন সংসার গড়বার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। তারপরে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠে পড়লে

হত্যাকারীরাও বাধ্য হয়ে শুতে আসত তাদের ঘরে। তিনি না উঠলে ওরা সারা রাতই বসে কাটিয়ে দিতে পারত সেই ভাবে।

কিন্তু ক্রমেই একটা ভয় পেয়ে বসল তাদের। মাদাম রাকুয়ঁার দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিল। বেশ বোঝা গেল কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আর চেয়ার ছেড়ে ওঠা-বসা কিছুই করতে পারবেন না। কথাবার্তা তাঁর ইতিমধ্যেই অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল; স্বর হচ্ছিল দুর্বল; এক এক করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ছিল অসাড়। নির্জীব পদার্থে পরিণত হচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সাহচর্যে, তাঁরই শান্ত সমাহিত কথার ভরসায় আতংকের বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পেত হত্যাকারীরা। তাই তাঁর পক্ষাঘাতে এরাও হতাশ হয়ে উঠল দুজনে। কালক্রমে সমস্ত বোধশক্তি লোপ পেল তাঁর। তখন হত্যাকারী দুজন হল মুখোমুখী নিঃসঙ্গ! রাত বারোটার অনেক আগে ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময়েই ঘনিয়ে আসত বিভীষিকার ছায়া।

তারা বহু চেষ্টা করল তাঁকে সারিয়ে তুলতে। ডাক্তার এল, বৈদ্য এল—সেবা ও শুশ্রূষারও কোন ত্রুটি রইল না কোথাও। তাঁর সেবা বরঞ্চ ভালই লাগল তাদের। তাই দ্বিগুন উৎসাহে রোগিনী নিয়ে মেতে উঠল দুজনে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে হারাতে চায় না তারা কেউ। তাদের অক্লান্ত সেবায় গলে গেলেন মাদাম রাকুয়ঁা। কথা বলবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। শুধু চোখের ভাষায় প্রকাশ করেন কৃতজ্ঞতা। তাঁর দুচোখ বেয়ে স্নেহাশ্রুর ধারা নামত। ভাবতেন সার্থক হয়েছে এদের হাতে তাঁর যথাসর্বস্ব তুলে দেওয়া। কে আশা করতে পেরেছিল একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর পর এত সুখ ছিল তাঁর অদৃষ্টে! পক্ষাঘাতের যাতনা ভুলে রইলেন তিনি ভাইঝি আর ভাইঝি-জামাই-এর সেবায়।

লরঁা থেরেসার দ্বৈত জীবন যাপনের কিন্তু অবসান ঘটেনি তখনো। একা একা থাকতে হলেই আতংকে মুহ্যমান হয়ে পড়ত তারা—আর

অন্তের সম্মুখে আনন্দে পাগল হয়ে যেত দুজনে। প্রকাশ্যে কখনো তাদের মুখ দেখে বোঝা যেত না—এত যাতনা ভোগ করছে তারা অহর্নিশি! বিধাতার আশীর্বাদ পূত দম্পতি-যুগল যেন সুখের সাগরে আছে ডুবে। গ্রীভে ঠাট্টা করত—"কপোত-কপোতী" বলে। অনিদ্রায় থেরেসার চোখের কোনে কালি দেখে ক্ষ্যাপাত, "খোকার নাম করণ হচ্ছে কবে।" আসরের সবাই তখন ফেটে পড়ত অট্টহাস্যে। লর‍্যাঁ থেরেসার সামান্যই ভাবের ব্যতিক্রম হত তাতে।

বুড়ো মিশ' প্রায়ই বলতেন, "দেখছ কেমন সুখী হয়েছে আমাদের বর-কনে! কথা বলে কম—কিন্তু সর্বক্ষণ পরস্পর ভাবছে পরস্পরের কথা। আমরা উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গে এদের যদি হুটোপটি শুরু না হয় ত কি বলেছি।"

পরিচিতের সকলেরই ঐ একই ধারণা—আদর্শ দম্পতি তারা। অথচ তারা ত জানে কতটা সত্য আছে এর পেছনে।

তেইশ

যে-মজা লুটবার জন্য লর‍্যাঁ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিয়ে করার, এবার বিয়ের চারমাস পর নজর দিল সে-সব সুযোগ সুবিধা আদায় করতে! এ-সব সুযোগ সুবিধার আশা না থাকলে কবে সে পালিয়ে যেত থেরেসাকে ছেড়ে! এখন আর তা হয় না। থেরেসাকে ছেড়ে যাওয়া মানেই দারিদ্র্য বরণ করা,চাকরী বজায় রাখার হাজারো হীনতা স্বীকার! আর তার সঙ্গে থাকলে ইচ্ছে করলে বসে বসেই সুখে দিন কেটে যাবে মাদাম রাকুয়াঁর সঞ্চিত অর্থে। নিজের হাতে টাকাটা থাকলে ত কবেই সে যেত হাওয়া হয়ে। মিশ'র পরামর্শে বৃদ্ধা রাকুয়াঁ শেষ মুহূর্তে ভাইঝির নামে টাকাটা রেখে তবু একটু সুবুদ্ধির কাজ করেছিলেন। কাজেই

কঠিন বন্ধনে লরাঁ আবদ্ধ ছিল থেরেসার সঙ্গে। রাত্রি জাগরণের বিভীষিকার পরিবর্তে সে যদি সারাটা দিন আলস্যেই না কাটাতে পারবে তাহলে কি লাভ হল তার এ বিয়ের ?

তাই একদিন সন্ধ্যেয় মাদাম রাকুয়াঁ আর থেরেসাকে সে বলল, অফিসের কাজে ইস্তাফা দিয়ে এসেছে। থেরেসা একটু চিন্তিত হল। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই লরাঁ বলে উঠল, যে আর একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সে ছবি আঁকা শুরু করবে। চাকরীর একঘেয়েমী, বড় বাবুদের অপমানের কাহিনী ফলাও করে বলে তাদের শোনাল আর্টের মহিমা। "একটু যখন নিশ্চিন্ত হতে পারব তখন দেখে নেবে ভাগ্য দেবী প্রসন্ন হন কিনা আমার ওপর।"

তার বক্তৃতার আড়ালে, আগের স্টুডিও জীবনে ফিরে যাবার যে প্রচ্ছন্ন কামনা ছিল—তা পরিষ্কার ধরা পড়ল থেরেসার কাছে। হাতের যৎসামান্য টাকা স্বামীর খেয়াল চরিতার্থ করতে উড়িয়ে দেবার মত সৎসাহস ছিল না থেরেসার ! তাই সে মনে মনে বিরক্তই হল লরাঁর প্রস্তাবে। লরাঁর প্রশ্নের খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিতে লাগল সে। লরাঁও বেশ বুঝতে পারল—চাকরী ছাড়লে—খুব সুখের জীবন হবে না তার। এক তীক্ষ্ণ সর্বগ্রাসী চাহনিতে গিলে খেতে চাইল সে থেরেসাকে। থেরেসার মনে হল লরাঁ তাকে শাসাচ্ছে,—"যদি টাকা না দাও ত বলে দেব সব কথা।" সে চাহনি দেখে শিউরে উঠল থেরেসা। তাকে কিছু না বলতে দিয়ে মাদাম রাকুয়াঁ নিজেই রাজী হয়ে গেলেন লরাঁর প্রস্তাবে।

অতঃপর ঠিক হল শিল্পীকে ঘরভাড়া ও খরচ-খরচা বাবদ মাসে একশ ফ্রাঁ করে দেওয়া হবে। পারিবারিক বাজেটও কাটছাঁট করা হল একটু—দোকান থেকেই তাদের বাড়ীভাড়া আর রোজকার খরচ চলে যাবে ; বার্ষিক আড়াই হাজার ফ্রাঁ আয় থেকে লরাঁ নেবে তার হাত

খরচা, আর বাকী টাকাটা লাগবে সংসারের অন্য নানা কাজে। তাহলে আর মূল পুঁজিতে হাত পড়বে না। এ ব্যবস্থায় থেরেসারও দুশ্চিন্তা কমলো খানিকটা! স্বামীকে শপথ করিয়ে নিল সে যে, ঐ টাকার এক কানাকড়ি বেশীও সে চাইবে না কোন দিন। যত যাই হ'ক লরাঁকে সে ঐ চল্লিশ হাজার ফ্রাঁতে কিছুতেই হাত দিতে দেবে না। এ বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প সে।

এক মাস ধরে তাক-করে-রাখা একটি ঘর পরদিনই ভাড়া করে এল লরাঁ। রু মাজারিন-এর একেবারে শেষে। সপ্তাহ দু-এক পরে একদিন বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল সে নতুন স্টুডিওতে। এখানে থেরেসার সাহচর্যে পীড়িত হবে না সে। ক্যামিলাসের প্রেতাত্মার বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবে সে কিছুক্ষণ।

স্টুডিওটি হল এক চিলে কোঠার মত। রাস্তার গোলমাল অতদূরে ওঠে না। নিজের খেয়ালে ঘর সাজালো লরাঁ; ভাঙা দুটো চেয়ার আনল কিনে, একটি সস্তায় ভাঙা টেবিল কিনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল, নবাবীআনার মধ্যে ছিল শুধু মাত্র ত্রিশ ফ্রাঁয় কেনা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বড় একটি কোচ।

কোন তুলির আঁচড় না কেটেই সে পুরো দু সপ্তাহ শুয়ে বসে কাটিয়ে দিল। সকাল আটটা থেকে নটার মধ্যে এসেই লম্বা হয়ে পড়ত কোচের ওপর; অপেক্ষা করত দুপুরের। দুপুরে বাড়ী যেত খাবার খেতে। তারপর ফিরে এসে ঘুমিয়ে নিত একটানা সন্ধ্যে পর্যন্ত। তার স্টুডিওতে ছিল গভীর প্রশান্তি—ভয়, ভীতি, আতংক বিভীষিকার লেশ মাত্র ছিল না সে-চৌহদ্দীতে। একদিন তার স্ত্রী চাইল স্টুডিওতে আসতে। সে বারণ করল। বারণ করা সত্ত্বেও যখন একদিন সে এসে দরজায় ধাক্কা মারল—তখন দরজা না খুলে চুপ করে পড়ে রইল লরাঁ! থেরেসা এলেই—ক্যামিলাসের প্রেতাত্মার বিভীষিকা আনবে সঙ্গে করে।

কিন্তু আলস্যেও বিরক্তি ধরে মানুষের। অবশেষে ক্যানভাস কিনে ছবি আঁকতে বসল একদিন। মডেল ভাড়া করবার মত টাকা না থাকায় সে মন থেকেই আঁকা ঠিক করল। পুরুষের মাথা নিল প্রথমে।

তাছাড়া এখন সারাদিন স্টুডিওতে শুয়ে বসে থাকতেও ভাল লাগে না তার। সে সকালে ও বিকেলে বেশ কিছুক্ষণ করে বেড়াতে আরম্ভ করল পারী ও শহরতলীতে। বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখা হয়ে গেল বহুদিনের পুরণো বন্ধুর সঙ্গে। পারীর সালোঁ-তে তার একটা ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়েছিল।

"কি ব্যাপার", শিল্পী হেঁকে উঠল, "তোমায় ত চেনাই ভার—এত শুকিয়ে গেছ!"

"বিয়ে করেছি।"—বিব্রত হয়ে জবাব দিল লরাঁ।

"বিয়ে! তুমি! তাই বলি এমন বেতাল দেখাচ্ছে কেন।....তা এখন কি করছো—"

বিয়ের কথা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পরিকল্পনার বর্ণনায় মুখর হয় উঠল সে। অবাক বিস্ময়ে বন্ধুটি তাকিয়ে রইল তার দিকে।

থেরেসাকে বিয়ে করে, অতীতের সেই সরল সজীব হাস্যোচ্ছল লরাঁ যেন হারিয়ে গেছে সভ্যতার মুখোশের আড়ালে। চলা ফেরা, কথাবার্তার ঢং-এ এসেছে গাম্ভীর্য, হাবভাব সব হয়েছে মার্জিত।

বন্ধুটি না বলে পারল না—"বেশ ভদ্দর লোক হয়ে উঠেছ ত হে। একেবারে হাল ফ্যাসানের রাষ্ট্রদূতদের মত যে সাজগোজ করেছ।"

বন্ধুর উল্লাস কেন যেন তেমন ভাল লাগল না লরাঁর। তাকে শুধু বলল, "একবার যাবে না স্টুডিওতে।"

"নিশ্চয়ই"—জবাব দিল সে।

কোন ভাল ছবি দেখবে আশা করে বন্ধুটি বলেনি সে-কথা। শুধুমাত্র

লরাঁর পরিবর্তনের সূত্র খোঁজবার কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সে উঠে এল স্টুডিওতে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই বিস্ময় গেল বেড়ে। পাঁচটি ছবির স্কেচ রয়েছে ঘরে—তিনটি মেয়ে ও দুটি পুরুষের মাথা। শিল্পী প্রতিভার প্রতিশ্রুতি আছে তাতে। কাছে এসে ভাল করে পরীক্ষা করে কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল—

"তুমি এঁকেছো এগুলো ?"

"হ্যাঁ, তা না ত কি ?" জবাব দিল লরাঁ। "এ স্কেচগুলো নিয়ে একটা বড় ছবি আঁকব পরে।"

"ঠাট্টা করো না। সত্যি বলছ তুমি এঁকেছ এগুলো ? তোমার মুরোদ ত জানতে বাকী নেই, বাবা! হাতে খড়ি দেওয়া ছাড়া আর বেশীদূর কি গড়িয়েছিল তোমার বিদ্যে ?"

শিল্পী বন্ধু অবাক বিস্ময়ে দেখছিল সে কাজগুলো। সেই অপরিচ্ছন্ন স্কেচের ভেতর থেকেই ফুটে উঠছিল প্রকৃত শিল্পীর নিপুণ হাতের ছাপ। এত প্রতিশ্রুতিময় কাজের পরিচয় পায়নি বন্ধুটি এর আগে কোথাও, সে স্বীকার করল।

"আমি কোনদিন ভাবতে পারি নি যে তুমি এমন ভাল ছবি আঁকতে পারবে। কোথায় শিখলে এমন কাজ ? এ ত বাবা ঘসা-মজার কর্ম নয়!"

আবার তাকাল লরাঁর দিকে। তার গলার স্বরে কেমন কমনীয়তা যেন—মার্জিত রুচির পরিচয় দিচ্ছে সব। এতদিনের তীব্র মানসিক আঘাতে তার প্রচণ্ড পরিবর্তন এনে দিয়েছে, ঘটেছে রূপান্তর।

কি করে পরিবর্তন ঘটল বলা মুশকিল। কাপুরুষতা যে-ভাবে অর্জন করেছে সে, হয়ত সে-ভাবেই নিজের অজানিতে হয়ে পড়েছে শিল্পী। এতদিন তার ছিল জৈব ক্ষুধার প্রেরণা মাত্র সম্বল। অটুট স্বাস্থ্যের চাপে চেয়েছে যৌন ক্ষুধার প্রশমন। আজ এই ভীতচকিত

জীবন পথে মেদ-বাহুল্য গেছে কমে। সেই সঙ্গে যৌন ক্ষুধারও ঘটেছে অবসান। তার স্থান নিয়েছে সূক্ষ্ম শিল্প বোধ। হাবভাব চালচলনে যেমন কমনীয়তা এসেছে হঠাৎ। তেমনি শিল্প-সৃজনের রসবোধও জাড়িত করে নিয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে। ফলে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে প্রতিভার স্পর্শে ভাস্বর।

যাবার আগে বন্ধুটি শুধু বলে গেল,

"তোমার ছবির সমালোচনা করব একটু। চরিত্রগুলি সব যেন মনে হচ্ছে একই পরিবারের। পাঁচটা মুখই দেখতে এক রকম। মেয়েদেরও মুখে এমন কর্কশ ভাব ফুটিয়ে তুলেছ যে, তাদেরও পুরুষ বলে ভুল হয়। বড় ছবি আঁকবার সময় এগুলো শুধরে নিও। তা নতুবা সবাইকে ভাইবোন বলে মনে হলে লোক হাসবে কিন্তু।—যাক, খুব ভাল লাগল তোমার এখানে এসে। এতদিনে অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস হচ্ছে যেন আমার। তুমি তাক লাগিয়ে দিলে একেবারে।"

সে চলে গেল। লরাঁও এসে ঢুকল স্টুডিওতে। অঙ্কিত চরিত্র গুলির ভিতর মিলের কথা শুনে সে চমকে উঠেছিল। এগিয়ে এসে ভাল করে দেখল ছবিগুলো। সত্যি সবকটির ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে ক্যামিলাসের মুখাবয়ব। যতই দেখতে লাগল খুঁটিয়ে—ততই জ্বলজ্বল করে উঠল—ক্যামিলাসের সাদৃশ্য। এতক্ষণ মনে পড়ল—লাসঘরে বহুক্ষণ ক্যামিলাসের গলিত শবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকার ফল হল এটি।

শিল্পী হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল কোচে। ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নের মত যেন ছবিগুলো উঠল জীবন্ত হয়ে। একটির জায়গায় পাঁচ পাঁচটি ক্যামিলাস!

হা, ভগবান!

উঠে বসে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল সব ছবিগুলো। নিজেই

যদি হত্যার বলির প্রতিকৃতিতে ঘর ভরিয়ে রাখে ত উপায় কি হবে! আরও ভয় হল—হয়ত যে-কোন মুখ আঁকতে গেলেই তার এসে পড়বে ক্যামিলাসের ছায়া। তক্ষুনি পরীক্ষা করতে চাইল কি হয়। নতুন ক্যানভাস এঁটে দিল ইজেল-এ। কয়েকটি আঁচড়ে আঁকল একটি মুখ—কিন্তু এও যে ক্যামিলাসেরই মত! বহু চেষ্টা করল—নতুন করে আঁকতে!

বারংবার ফল হল একই। সাধারণ মানুষ ছেড়ে দিয়ে—কত দেবদূত, সৈন্যসামন্ত—মায় জীবজন্তু পশুপাখীর ছবি আঁকল সে। কিন্তু তাদেরও মনে হল ক্যামিলাসের মত।

গভীর আতংকে অভিভূত হল সে। না, আর সাহস হল না তার আঁকতে। শান্তিতে থাকতে চাইলে স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকতে পারবে না যে কোনদিন। হাত যেন নিজের বশে নেই আর।

চব্বিশ

অবশেষে মাদাম রাকুঁয়ার সম্বন্ধে যে আশংকা তারা করছিল—তা একদিন সত্যে পরিণত হল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতের ক্রিয়া আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ একদিন গলা অবধি সারা দেহ পড়ল অবশ হয়ে। এক সন্ধ্যায় লরাঁ আর থেরেসার সঙ্গে গল্প করার সময় কথার মাঝখানেই তিনি পড়লেন থেমে। অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ তখনও তাঁর মুখে, তাঁর মনে হল কে যেন দম বন্ধ করে মারতে আসছে তাঁকে। চীৎকার করে কাঁদতে গিয়ে দেখেন গলা দিয়ে শুধু বেরোচ্ছে গোঙানীর ঘসঘসানি। জিহ্বায় এসেছে পাথরের জড়তা; বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেছেন তিনি।

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠল লরঁ। ও থেরেসা। প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড ধরে এ যাতনা ভোগ করছিলেন তিনি। তারপর শক্ত তক্তার মত ঠায় বসে রইলেন! শুধু করুণ নয়নে সাহায্য প্রার্থনা করলেন সন্তান-সন্ততিদের। তারাও কত প্রশ্ন করল তাঁকে—জিজ্ঞাসা করল কি কষ্ট হচ্ছে। কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেবার সাধ্য ছিল না তাঁর। এতক্ষণে তাদের বোধগম্য হল যে, বৃদ্ধা হয়েছেন অর্ধমৃত—অসাড় জিহ্বায় কোন বাকৃশক্তিই নেই আর। তিনি দেখতে শুনতে পাবেন সবই কিন্তু মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন চির তরে।

মহাসংকটের আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ল তুজনে। মনে মনে যে তারা তেমন দুঃখিত হয়েছিল মাদাম রাকুঁয়ার অবস্থা বিপর্যয়ে তা নয়। তারা কাঁদছিল নিজেদেরই দুঃখের বোঝার ভারে। কি করে উভয়ের সান্নিধ্যে তারা এখন থেকে সময় কাটাবে সেই চিন্তায় গায় কাঁটা দিয়ে উঠল তাদের।

তখন থেকে তাদের জীবন হল আরও দুর্বিসহ। রুদ্ধবাক্ বৃদ্ধার মুখোমুখী বসে নিদারুণ যম যন্ত্রণায় কাটে তাদের সন্ধ্যেগুলো। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বস্তার মত পড়ে রইলেন তিনি—আর টেবিলের অন্য ধারে অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটাত তারা তুজন। মাঝে মাঝেই তারা আবার ভুলেই যেত ঘরে কোন মানুষের অস্তিত্ব আছে বলে। তখন তাঁকে মনে হত আসবাব পত্রেরই অংশ বিশেষ। রাতের বিভীষিকা গ্রাস করতো তাদের। শোবার ঘরের মত খাবার ঘরেও এবার ক্যামিলাসের প্রেতাত্মার আবির্ভাব হতে লাগল ঘনঘন। রাতের আতংকের ঘোর বেড়ে গেল—আরও চার পাঁচ ঘণ্টা। সাঁঝের আঁধারের সঙ্গেই দুষ্কৃতিকারীরা কাঁপতে থাকত বিভীষিকায়। তখন মনে হত মাদাম রাকুঁয়া যদি ভাল মানুষের মত একটু কথা বলতে

পারতেন! তাঁর চোখ দুটোর জ্বলজ্বলে ভাব দেখে—তবু তারা সান্ত্বনা পেত একটু। তাই তখনও কাছে কাছেই রাখত তাঁকে।

সব সময় তারা অথর্ব বৃদ্ধাকে বাতির আলোর মুখোমুখী বসিয়ে রাখত। মুখের উপর আলোর প্রতিফলনে—সে জীবন্ত চোখ দুটির সাহায্য কামনা করত তারা নিরন্তর। অন্য যে কোন লোকের কাছে সে পঙ্গু-বৃদ্ধার সঙ্গ অসহ্য হলেও এদের কাছে তাকেই মনে হচ্ছিল ত্রাতা বলে। চোখ দুটো যেন মৃতের মুখে বসান। ভাবলেশহীন সে চোখ দুটি নড়ছে চোখের কোঠায়। মুখ ও গাল যেন জমে পাথর হয়ে গিয়েছে; ভয় করে স্থানুত্বে। ঘুমিয়ে পড়ে চোখ বুজলে—সেই কাগজের মত ফ্যাকাশে সাদা মুখ মনে করিয়ে দেয় মরার মুখের কথা। কোনও পার্থক্য থাকে না মৃতের মুখের সঙ্গে। হঠাৎ নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করে লরাঁ ও থেরেসা তখন এমন হট্টগোল আরম্ভ করে যে বৃদ্ধাকে আবার চোখ খুলে তাকাতে হয় তাদের দিকে। এমনি করেই তারা জাগিয়ে রাখত তাঁকে।

এদের আতঙ্কিত দুঃস্বপ্নের বোঝা লাঘব করবার উপকরণ ছিলেন বৃদ্ধা। পক্ষাঘাতের পর শিশুর মত পরিচর্যা করতে হত তাঁর। সেই পরিচর্যা করতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যও নিজেদের কথা ভুলে থাকতে হত তাদের। ভোরে উঠে লরাঁ তাঁকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিত চেয়ারে। আবার রাত্তিরে কোলে করে এনে শুইয়ে দিত বিছানায়। আর বাকী সব কাজ করতে হত থেরেসাকে। তাকে চান করিয়ে, খাইয়ে, কাপড়-চোপড় পরিয়ে দিত থেরেসা আর প্রাণপণ চেষ্টায় বুঝতে চাইত পিসীর মনের কথা। কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁর হাত নাড়বার ক্ষমতা ছিল। তখন স্লেটে লিখে দিতেন যা চাইতেন। তারপর সেই হাতও গেল অবশ হয়ে। সামান্য পেন্সিল ধরা কি হাত তোলার আর সাধ্য রইল না তাঁর। চোখের অপলক দৃষ্টির ভাষা ছাড়া অন্য

কোন উপায় রইল না তাঁর মনের কথা বুঝাবার। সেবার এই গুরু দায়িত্ব পূর্ণ কাজটি কঠিন হলেও থেরেসার বেশ ভালই লাগছিল।

দুজনে মুখোমুখী থাকার ভয়াবহতা কাটাবার জন্যে ভোরে উঠে লরাঁর প্রথম কাজই হল বৃদ্ধার চেয়ার টেনে নিয়ে আসা খাবার ঘরে। উভয়ের মধ্যে বসিয়ে দিত তাঁকে এনে। খাবার কিংবা কথাবার্তার সময় তাঁর উপস্থিতি হল অপরিহার্য। কখনো তিনি নিজের ঘরে যেতে চাইলে—এরা সে ইচ্ছা না বোঝবার ভান করত। নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব বলতে তাঁর আর কিছু রইল না—দুষ্কৃতিকারীদের আতংক কমাবার এক উপকরণ বিশেষে পরিণত হলেন তিনি।

সকাল আটটায় লরাঁ বেরিয়ে যেত তার স্টুডিওতে। থেরেসা নেমে আসত দোকানে—আর দুপুর পর্যন্ত সেই পঙ্গু বৃদ্ধা একা পড়ে থাকতেন খাবার ঘরে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে আবার সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত কাটাতে হত তাঁকে ঐ ভাবে। দিনের বেলা ভাইঝিটি মাঝে মাঝেই এসে তদারক করে যেত তাঁর। থেরেসা আর লরাঁর এই অদৃষ্টপূর্ব সেবা দেখে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই অবাক হয়ে গেল। প্রশংসার ভাষাই হারিয়ে গেল তাদের মুখে।

বিষ্যুৎবারের আসরে ছেদ পড়েনি তখনও। স্থবির বৃদ্ধাও আগের মতই এসে বসেন তাঁদের সকলের মধ্যে। টেবিলের গা-ঘেঁষে টেনে দেওয়া হত তাঁর চেয়ার। রাত আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তিনি তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন অতিথিদের খেলা। প্রথম বৃদ্ধ মিশঁ ও গ্রীভে বড় বিব্রত বোধ করতেন জীবিত "শব" পুরানো বন্ধুটির সম্মুখে। কি যে করবেন, কি কথা বলবেন, মুখের হাব-ভাব কেমন করবেন কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারেন নি কেউ। তাঁরা কি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবেন এঁর অস্তিত্ব? না কি আগের মতই কথা কইবেন এই রুদ্ধবাক্ বৃদ্ধার সঙ্গে? ক্রমে ক্রমে সবাই তাঁর সঙ্গে

এমন ব্যবহার শুরু করলেন যেন কিছুই হয়নি তাঁর। এই অবস্থান্তর সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই স্থির হল সর্ববাদী সিদ্ধান্তে। তাঁরা আলাপ শুরু করলেন তাঁর সঙ্গে, প্রশ্নের উত্তর পান আর নাই পান। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেন ইচ্ছে মত। হাসি, ঠাট্টা সব কিছুরই তাল চলল সমানে।

বাচ্চাদের পুতুল খেলার মত হল ব্যাপারটা। পক্ষাঘাতগ্রস্তা বসে থাকেন নির্বিকার ভাবে আর তাঁকে কেন্দ্র করে হাসি উচ্ছ্বাস চলে পুরোদমেই। এভাবে সহজ আলাপ-আলোচনার বুদ্ধি বার করার জন্য মিশ' ও গ্রীভে মনে মনে বেশ গর্বই অনুভব করতে লাগলেন। গ্রীভের দৃঢ় ধারণা তিনিই একমাত্র বুঝতে পারেন মাদাম রাকুঁয়ার মনের কথা। কিন্তু নিজে নিজে তা ভাবলে হবে কি। প্রত্যেক বারই ভুল হত তাঁর। খেলার মাঝে মাঝেই সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠতেন, মাদাম রাকুঁয়া এটা চান—কি ওটা চান। তারপর হয়ত কাজের সময় দেখা গেল তাঁর কোন আন্দাজই খাটে নি। তাতেও দমবার পাত্র নন তিনি। আবার একটু পরেই শুরু করতেন নতুন কোন কাজের কথা।

পঙ্গু বৃদ্ধার মনের কথা বোঝা অত সোজা নয়। তাঁর চোখের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা ছিল একমাত্র থেরেসার। অতি সহজে মনের কথা আদান-প্রদান করতে পারত সে। কে বলতে পারে তাঁর মনে কি হচ্ছে—কি ব্যথার দাহ জ্বলছে তাঁর অন্তরে কে তার খবর রাখে? লরাঁও প্রায়ই তাঁর দিকে তাকিয়ে ভাবত—"একা একা বসে যে বুড়ি দিনরাত কি ভাবেন! হয়ত কত দুঃখের বোঝায় ভারী হয়ে উঠে ওঁর মন।"........

লরাঁর ধারণা ঠিক নয়। প্রিয় সন্তানদের সেবা-পরিচর্যায় আনন্দেই ডুবে ছিলেন তিনি। এমনি সুখের দিনের স্বপ্নই দেখেছেন তিনি সারা জীবন। তবে রুদ্ধবাক্, পঙ্গু হয়ে কে কাটাতে চায় জীবন? তা বলে অদৃষ্টের দোষ দিয়ে আর ভারাক্রান্ত করতে চাইতেন না জীবন। আবার অসহায় শিশু হয়ে পড়লেন যেন। অতীতের স্মৃতিতে অবগাহন

করে শূন্য দৃষ্টিতে কাটিয়ে দিতেন প্রহরের পর প্রহর। মোটেই খারাপ লাগত না তাঁর এভাবে অচল, অনড় হয়ে বসে থাকতে।

দিনকে দিন তাঁর চোখের ভাব হল তীক্ষ্ণ, দৃষ্টি হল স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর। সুস্থ লোকের হাত, পা, মুখের মতই তিনি চোখ দিয়ে মনের সব কথা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন সবাইকে। কখনো তাতে ফুটে উঠত স্বর্গের সুষমা—কখনো বা আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত চোখ দুটি। ঠোঁটের কোণায় হাসির বদলে চোখের উদ্বেল হাসি বড় অপূর্ব লাগত সকলের। রোজ ভোরে লরা তাঁকে কোলে করে আনবার সময় তিনি বিগলিত হতেন কৃতজ্ঞতায়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করতেন তাদের আশীর্বাদ।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল দেখতে দেখতে। বৃদ্ধা এমনি সুখের ভেতর দিয়ে রইলেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। ভাবলেন তাঁর ভোগান্তির ঘটেছে অবসান। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে দেরী হল না তাঁর। নির্মম আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন এক সন্ধ্যেয়।

বৃথাই থেরেসা ও লরা তাঁকে বসিয়ে রাখত আলোর নীচে নিজেদের মধ্যেখানে। তাঁর উপস্থিতিতে কোনই উপশম হল না বিভীষিকার। তাদের বিবেক যন্ত্রণায় বিভীষিকা আচ্ছন্ন করলে তারা একেবারে ভুলে যেত পক্ষাঘাতগ্রস্তা বৃদ্ধার অস্তিত্ব—পাগলের মত প্রলাপ বকত তখন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজেদের কুকীর্তির সব রোমহর্ষক কাহিনী। তাদের সেই কথাবার্তার রেশ হঠাৎ বুঝতে পারলেন বৃদ্ধা!

প্রচণ্ড যন্ত্রণার কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আঘাতের ব্যথা এত তীব্র হয়ে উঠল যে থেরেসার মনে হল তিনি বুঝি বা লাফিয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করবেন। তারপরই এলিয়ে পড়লেন আবার নিজের চেয়ারে; মুহূর্তের জন্য অনুভূতির শিহরণ জেগেই আবার মিলিয়ে গেল

কোথায়! অথর্ব বৃদ্ধা পড়ে রইলেন আরও অসহায় ভাবে—চোখের সেই মধুর বাৎসল্যভরা চাহনির জায়গায় দেখা দিল কর্কশ, কঠিন রুক্ষতা। এর চেয়ে হতাশায় অভিভূত হয়নি বুঝি কোনও মানুষ কখনো! বিদ্যুৎ চমকানোর মত মর্মান্তিক সত্যটি খান্‌খান্‌ করে ফেলল তাঁর অন্তর। উঠবার সামর্থ্য থাকলে, আর্ত চীৎকারে পুত্রহন্তাদের অভিশাপ দিতে পারলে বুঝি সান্ত্বনা পেতেন তিনি একটু। কিন্তু সমস্ত কিছু শুনে সমস্ত কিছু জেনেও তাঁকে স্থাণুর মত মূক সেজে থাকতে হল। কেবলই মনে হতে লাগল গজাল ঠুকে তাঁকে যেন চেয়ারে আটকে রেখে লর। আর থেরেসা কানের কাছে অনবরত পাখী পড়ান করে শোনাচ্ছে একই কথা "আমরা খুন করেছি ক্যামিলাসকে।" অসহায় দুঃখ, যাতনা আতংকে অধীর হয়ে উঠলেন তিনি। অমানুষিক চেষ্টায় ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন জগদ্দল পাথরের বোঝা বুকের উপর থেকে, ভাষা দিতে চাইলেন হতাশার দীর্ঘশ্বাসকে। বৃথাই চেষ্টা করলেন তিনি সামর্থ্যের শেষ সম্বলটুকু সঞ্চয় করে আবার স্বাভাবিক হয়ে কথা কইতে! মৃতের ক্লৈব্য পঙ্গু করে রাখল তাঁকে।

তাঁর অন্তর্দাহের রূপ ছিল আরও ভয়াবহ। এক সর্বধ্বংসী ভূমিকম্পের মতন চলেছে যেন ঐ বুকের ভেতর। ব্যর্থ হয়ে যাবে সারা জীবনের সাধনা? সকল সেবা, সকল করুণা সকল বাৎসল্যের একি মর্মান্তিক পরিণতি!

ঠিক যে মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ফেলবেন তিনি আনন্দের পরিবেশে তখনই কিনা এল এই আঘাত! কে যেন তাঁর কানের কাছে চীৎকার করছে—সব মিথ্যা, সব ফাঁকী—বীভৎস অপরাধে ভরা এ জীবন। সে আচ্ছাদনী ভেদ করে তাঁর মানস চোখে ভেসে উঠল রক্তের নদী। সামর্থ্য থাকলে তিনি চেঁচিয়ে আকাশ মাথায় তুলতেন। ভগবানকে দিতেন ধিক্কার—এই ষাট বছর ধরে তাঁকে মহাশূণ্যের বুকে ঠেলে দেবার

জন্য। কী রইল তাঁর জীবনে হত্যার বিভীষিকা আর রীরংসার লোলুপতা ছাড়া।

উঃ! ক্যামিলাস মরেছে থেরেসা আর লরাঁর হাতে! আর কিনা এ হত্যার পরিকল্পনা করল তারা অবৈধ প্রেমের মধ্যে। এত অতলস্পর্শী আঁধার গহ্বর বলে মনে হল এই রহস্য যে মাদাম রাকুয়াঁর সাধ্য হল না তার পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করেন।

আঘাতের প্রথম প্রচণ্ডতা কেটে গেলে অবিশ্বাস্য মনে হল এ কথা। তারপর অতীতে এদের দুজনের ব্যবহারের যে নানা অসঙ্গতি তাঁর নজরে পড়ত সে সব কথা ক্রমেই মনে পড়ায় বিশ্বাস জন্মালো তাঁর অবশেষে। সত্যি সত্যিই লরাঁ আর থেরেসা খুন করেছে ক্যামিলাসকে। যে থেরেসাকে তিনিই করেছেন লালন পালন—যে লরাঁকে তিনিই সিঞ্চিত করে রেখেছিলেন অগাধ মাতৃস্নেহে সেই লরাঁই করল ক্যামিলাসকে খুন? অথচ এর কোন প্রতিকারের সাধ্য নেই তাঁর! অসহায়ের অশ্রুজল ঝরতে লাগল আবার দুই গাল বেয়ে।

আতংকিত করুণায় অভিভূত হল থেরেসা। লরাঁকে বলল,

“এসো ওঁকে শুইয়ে দি বিছানায়।” লরাঁও চেয়ার টেনে নেবার উপক্রম করল তার শোয়ার ঘরের দিকে। তারপরে নীচু হয়ে তুলতে গেল তাঁকে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন মাদাম রাকুয়াঁ শেষবারের মত একবার তাঁর পায়ে বল দিতে। লরাঁর সাহায্য না নিয়েই যেন দাঁড়াতে পারেন তিনি। বজ্র পতনে মৃত্যু হয় না লরাঁর? হা ভগবান একি করলে তুমি! উঠবার সামর্থ্য হল না ত বৃদ্ধার—বজ্রের পতনেও মৃত্যু হল না লরাঁর। ক্যামিলাসের হত্যাকারীর কোলেই উঠতে হল তাঁকে অবশেষে! লরাঁর কাঁধে এলিয়ে পড়ল তাঁর মাথা!

বিড়বিড় করে লরাঁ বলল—

“তাকাও না যত ইচ্ছে—ও দৃষ্টিতে তো আর গিলে খাবার সাধ্য

নেই তোমার।..." তারপর নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল তাঁকে বিছানায় উপর। ভীতি ও বিরক্তিতে অভিভূত তখন, তিনি। আর সেই থেকে সকাল সন্ধ্যেয় লরাঁর কোলের অসহ্য স্পর্শ হইতে হল তাঁকে মুখ বুঁজে।

পঁচিশ

নিছক আতংকের বসেই মাদাম থেরেসার সামনে তাদের মুখ থেকে কথা বেরিয়ে পড়েছিল, এ মর্মন্তুদ ঘটনার কথা বলে কেউই তাঁকে কষ্ট দিতে চায়নি।

পরের বিষ্যুৎবারের সন্ধ্যেয় তাদের ভীষণ অস্বস্তি হল। ভোরে উঠেই থেরেসা লরাঁকে জিজ্ঞেস করল পিসীকে আবার ঘরে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কি না। বৃদ্ধা ত সবই জানেন যদি কিছু প্রকাশ করে দেন ?

"কি যা-তা বকছ"—ধমকে উঠল লরাঁ—

"হাতের আঙুলটি পর্যন্ত তাঁর নাড়বার ক্ষমতা নেই আর তিনি কিনা বলবেন সব কথা।"

"যদি কোন ফন্দী বার করেন তিনি", জবাব দিল থেরেসা। "সে রাত থেকেই তাঁর চোখে দেখেছি কাঠিন্যের ছায়া।"

"না, না ডাক্তার বলেছেন তাঁর আর কোন আশাই নেই। মরবার সময় ছাড়া আর তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বেরোবার সম্ভাবনা নেই। আর বেশীদিন বাঁচবেনও না তিনি। আজকে তাঁকে মজলিসে না ডেকে কেন আবার ভারী করি নিজেদের বিবেককে ?"

থেরেসা শিউরে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যেয় অতিথিরা এসে মাদাম রাকুয়াঁকে তার অভ্যস্ত

জায়গাতেই দেখতে পেলেন। লরাঁ ও থেরেসার কোন ভাব ব্যতিক্রম বোঝা গেল না। অন্তরের কাঁপুনি রাখল তারা অন্তরে চেপে।

খেলতে বসার আগে অতিথিরা অভ্যেস মত নানা গল্পগুজব করতে লাগলেন। গ্রীভে ও মিশ' পক্ষাঘাতগ্রস্তা বৃদ্ধাকে তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে ভোলেন নি। তারপর সবাই মেতে উঠলেন খেলায়।

সাংঘাতিক গুপ্তকথাটি টের পাবার পর থেকে এই আসরের অপেক্ষা করছিলেন মাদাম রাকুয়াঁ। শেষ শক্তিটুকু অদম্য চেষ্টায় সঞ্চিত করে চাইলেন হত্যাকারীদের স্বরূপ প্রকাশ করতে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আশংকা ছিল হয়ত এরা তাঁকে এখানে আনবেই না। একবার যখন এখানে এসেছেন—তিনি শেষ চেষ্টা করে দেখবেনই দেখবেন। কথা বলতে পারবেন না বলে অন্য কৌশলের আশ্রয় নিলেন তিনি। প্রচণ্ড মানসিক প্রয়াসে তিনি ডান হাতটা সামান্য নাড়তে পারলেন। কোলের উপর থেকে আস্তে আস্তে হাত তুলে টেবিলের পায়া ধরে অয়েল ক্লথের উপর ফেলে রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন একটু একটু করে।

এতক্ষণে নজর পড়ল সকলের এদিকে। অবাক হয়ে গ্রীভে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। "দেখ, দেখ থেরেসা," মিশঁ চেঁচিয়ে উঠলেন, "মাদাম রাকুয়াঁ আঙুল নাড়ছেন। কি যেন চাচ্ছেন তিনি।"

থেরেসার মুখ দিয়ে কোন জবাব বেরুল না। পিসীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল প্রতিহিংসার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে সে মুখে। রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল হত্যাকারীরা।

গ্রীভে চেঁচিয়ে উঠল "ঠিক, ঠিক, আমি বেশ বুঝেছি তিনি কি চান। উনি পাশা খেলবেন। ঠিক, না?" মাদাম রাকুয়াঁ তীব্র ভঙ্গীতে জানালেন, "না"। একটি আঙুল সোজা করে অন্যগুলো ভাঁজ করে টেবিলের গায় কি লেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। লেখা সবে শুরু

করেছেন কি করেন নি অমনি গ্রীভে আবার চীৎকার করলেন—"উনি আমার "কচ্ছয় বারোর" দান ঠিক হয়েছে বলতে চান।"

আবার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বৃদ্ধা গ্রীভের দিকে। তারপর শুরু করলেন লিখতে। মিশ' ও অলিভিয়ের ঝুঁকে দেখতে লাগলেন তাঁর লেখা। হঠাৎ অলিভিয়ের বলে উঠল, "আরে উনি যে আপনার নাম লিখছেন—**থেরেসা আর**....দুঃখে, হতশোয় কাঁদতে ইচ্ছে হল থেরেসার। আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রইল তাঁর আঙুলের গতির দিকে। তার নাম লিখছেন না যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছেন সারা দেহে। লরাঁ লাফিয়ে উঠে ভাবছিল ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়ীর হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেবে কি না। আর কোন আশাই নেই তাদের! ক্যামিলাসের হত্যা রহস্য লেখায় রত বৃদ্ধার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে ভেসে উঠল শাস্তির দৃশ্য!

মাদাম তখনো লিখে চলেছেন।

"বেশ স্পষ্ট পড়তে পারছি ওঁর লেখা", বলল অলিভিয়ের। "আপনাদের দুজনের নাম লিখেছেন তিনি—**থেরেসা আর লরাঁ**..."

বৃদ্ধা বারংবার সায় দিলেন তার কথায়। হত্যাকারীরা তাঁর তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে হতবিহ্বল হয়ে উঠল। তারপর তিনি আবার চেষ্টা করলেন লিখতে। কিন্তু আঙুলের ডগায় অনুভূতির প্রাবল্য আসছে মুহুর্মুহু কমে। সেই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি হল শিথিল, আবার হাতের শিরা বেয়ে নামতে পক্ষাঘাতের আঘাত! সময় নাই! তিনি দ্রুত লেখবার চেষ্টা করলেন।

বৃদ্ধ মিশ' চেঁচিয়ে পড়লেন, **থেরেসা আর লরাঁ হল**...."

ব্যগ্রকণ্ঠে অলিভিয়ের প্রশ্ন করল :

"কি হয়েছে আপনার ছেলে-বৌ এর ?

আতঙ্কে অভিভূত হত্যাকারীদের নিজেদের মুখ দিয়েই বাকী

কথাটা বেরিয়ে আসছিল আর কি। একদৃষ্টিতে যখন তারা তাকিয়ে ছিল সেই প্রতিশোধকামী হাতের দিকে তখন হঠাৎ অবশ হয়ে পড়ল আবার মাদামের হাত। শত চেষ্টাতেও ওঠাবার ক্ষমতা হল না সে-হাত। হতাশ মিশ' ও অলিভিয়ের আবার খেলতে বসল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন হত্যাকারীদের। সবাই বলতে লাগল থেরেসা আর লরাঁর সেবার কথাই বলতে চাচ্ছিলেন বৃদ্ধা এত করে। সর্বজ্ঞ গ্রীভে বললেন,

"মাদাম রাকুয়াঁর চোখ দেখেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি বলতে চান, "থেরেসা আর লরাঁ হল আমার ত্রাণ কর্তা! অতিথিরা সবাই আর একবার দম্পতিযুগলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

আবার খেলা শুরু হল পূর্ণোদ্যমে। পাশেই পক্ষাঘাতগ্রস্তা হতাশা-ক্ষুব্ধ বৃদ্ধা রইলেন পড়ে। তাঁর দৃষ্টি নিজের হাতের দিকে। হায় হায়—এ কোন সংকট মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করল নিজের হাত তাঁর সঙ্গে! পাথরের মত ভারী মনে হচ্ছে হাতটি এখন। ভগবানেরই ইচ্ছে নয় তাহলে ক্যামিলাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়! পুত্রের হত্যার কাহিনী বলবার আর সাধ্য কোথায় তাঁর! পরলোকেই গিয়ে মিশবেন একেবারে তার সঙ্গে, তখনই পাবেন শান্তি। চোখ বুঁজলেন তিনি গভীর হতাশায়।

ছাব্বিশ

পুরো দুমাস হল থেরেসা ও লরাঁ এ ভীষণ নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। একের কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হচ্ছে অন্যকে। ক্রমেই ঘৃণার উদ্রেক হল তাদের মনে, চোখে ভেসে উঠল রাগের ছায়া আর চাহনিতে দেখা দিল ভয় দেখানোর ভাব।

ঘৃণার আবির্ভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে তারা ভালবেসেছিল পশুর মত অন্ধ মত্ততায়। তারপর প্রণয়ের ঘোরে যে অপকীর্তি তারা করল তাতে প্রেমের স্থান দখল করল বিভীষিকা। আর এখন বিয়ের পর তাদের দেহ মন করছে বিদ্রোহ। আক্রোশে দগ্ধে যাচ্ছে উভয়ে। বিজাতীয় ঘৃণা—তীব্র আক্রোশ বাসা বেঁধেছে তাঁদের মনে। উভয়েই বুঝতে পারছিল তারা পরস্পর পরস্পরের গলগ্রহ বই কিছু নয়। মুখোমুখী না হতে হলে তবু এক রকম শান্তিতে থাকবে তারা। সুযোগ পেলে যেন গিলে খাবে একে অন্যকে।

মনের গভীরে কিন্তু হানা দিচ্ছিল একটি মাত্র ভাবনা। অপরাধ করে তারা এখন ক্ষেপে উঠেছিল নিজেদের উপর। বেশ বুঝতে পারল যাবজ্জীবন এ নরক যন্ত্রণার হাত থেকে আর রেহাই নেই তাদের। তাই আরও উন্মত্ত হয়ে উঠছিল তারা।

তারই প্রকাশ পেতে লাগল নিত্য নৈমিত্তিক ঝগড়ায়। সন্ধ্যে হলেই একে অন্যকে বিদ্ধ করত বাক্যবাণে। অকারণেই বাধত ঝগড়া। কোথায় ডিস পাওয়া গেল না হাতের কাছে—কোন জানালা ছিল খোলা এই নিয়েই হয়ত বেধে যেত তুমুল তুলুক্রাম কাণ্ড। পরদিনেও তার রেশ থামত না। শেষ পর্যন্ত উভয়ে হত্যার দোষারোপ করত উভয়ের উপর।

সাধারণতঃ খাবার পরে লাগত তাদের ঝগড়া। সে-ঝগড়ার সব কথাই কানে যেত মাদাম রাকুয়াঁর। ঝগড়ার মুখে তিনি জানতে পারলেন ক্যামিলাস হত্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনা সমূহ।

কখনো কখনো অনুশোচনা হত থেরেসার। দুঃখ হত পিসীকে দেখে। লরাঁকে অনুনয় বিনয় করে বলত চুপ করতে। লরাঁ উড়িয়ে দিত তার কথা।

"কি হবে তাতে? ওঁর ত আর কোন কথা বলবার ক্ষমতা নেই?"

তারপরেই আবার শুরু হত ঝগড়া পুরোদমে।

একদিন রাতে লর‍্যাঁ অছিলা খুঁজছিল ঝগড়া বাধাবার। খুঁজতে খুঁজতেই সুযোগও মিলে গেল। খাবার জল গরম দেখে তিরিক্ষি মেজাজে ঝাঁজিয়ে উঠল থেরেসাকে,

"জান যে গরম জল খেলে বমি বমি ভাব হয় আমার তবু কেন ঠাণ্ডা করে রাখতে পার না খাবার জল?"

"বরফ পাইনি।" জবাব দিল থেরেসা।

"বেশ, খাব না—তাই ত চাও?"

"কেন, এ জল ত বেশ ভাল।"

"না না—কেমন গরম আর কাদার গন্ধ এতে—নদীর জল বলে মনে হয়।"

"নদীর জল!" পুনরাবৃত্তি করল থেরেসা। কথাটি বলতেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। কথাটিতে অন্য এক স্মৃতি জেগেছে তার মনে।

লর‍্যাঁ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হল আবার?"

"কেন কাঁদছি জান না? তুমিই কিনা তাকে মারলে শেষে!"

"মিথ্যেবাদী"—খেঁকিয়ে উঠল লর‍্যাঁ। "বল যে তুমিও মেরেছ তাকে। আমি যদি তাকে জলে ছুঁড়ে থাকি ত তুমি তাকে মারতে আমায় উস্কে দিয়েছিলে।"

"আমি, আমি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই……ন্যাকামী করতে হবে না আর। এই খুনের ব্যাপারে ভালয় ভালয় নিজের দোষ স্বীকার করো।"

"কিন্তু আমি ত ডোবাই নি ক্যামিলাসকে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমিই ডুবিয়েছ। কিছু যেন মাথায় ঢুকছে না—না?"

থেরেসার অস্বীকৃতিতে আরও চঞ্চল হয়ে উঠল লর‍্যাঁ। রাগে গজ্ গজ করতে করতে—ঘুরতে লাগল ঘরের চারপাশে। "তুমিই না

একদিন রাতে বেশ্যার মত আমার ঘরে এসে কত কাণ্ড করে ক্যামিলাসকে খুনের বুদ্ধি দিলে আমার মাথায়?, আর আজ সব ভুলে যাচ্ছ, না?"

থেরেসা তবু বলেই চলেছে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিই খুন করেছে ক্যামিলাসকে।"

"না, না, হাজার বার বলছি, আমি তাকে মারি নি। তুমি আমায় না উস্কালে কোন দিনই সে খুন হত না।"

অসহ্য রাগে থেরেসাকে মারতে হাত তুলল লরাঁ।

"মারো, মারো যত পার মার"—বলে মুখ বাড়িয়ে দিল সে। আপনা থেকেই হাত নেমে এল লরাঁর।

তাদের ঝগড়ার প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিলেন বৃদ্ধা। থেরেসাকে মারতে হাত তোলার সময় প্রতিশোধের আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল তাঁর চোখে।

সাতাশ

একটা নতুন পর্যায় শুরু হল তাদের জীবনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোনই মীমাংসা করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থেরেসা মৃত স্বামীর শোকে অনুতাপ প্রকাশ করতে লাগল লরাঁর সম্মুখেই।

হঠাৎ মনটা ভেঙে গেছে তার। চিন্তাক্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী আর যেন চলতে চাচ্ছিল না। সেই উদগ্র স্বভাব কেমন মিইয়ে গেল। বিয়ের প্রথম দিকও তার মাঝে মাঝে দুঃখ হত; অনুশোচনার দংশন করত অনুভব। অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেই দিনগুলোই এল ফিরে। একদিন যে মনের জোর নিয়ে ক্যামিলাসের বিভীষিকার

বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সে বিদ্রোহ করেছিল। অকস্মাৎ কোথায় হারিয়ে গেল সেই মনের জোর। একেবারেই ভেঙে পড়ল সে। স্বীকার করল পরাজয়। এবার শুরু হল অনুশোচনার দাহ—করুণা ভিক্ষার চেষ্টা ও অশ্রুজলের প্রায়শ্চিত্ত। মনে হল সান্ত্বনা আসবে এই পথে। ক্যামিলাসের প্রেতাত্মাকে শান্ত করবার এটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ উপায়, ভাবল তরুণী। হিসেব কষেই তবে যেন এ পথে পা বাড়াল সে। হৃদয়ের অতলে শুধু মাত্র ভয়-ভীতি নিয়ে বুক চাপড়ে অনুশোচনার অভিনয় করতে লাগল থেরেসা। নিজেকে এভাবে নিগৃহীত করেও আনন্দ পেল সে।

অশ্রুজল হতাশার ভারে সে পাগল করে তুলল মাদাম রাকুঁয়াকে। স্থাণু, পঙ্গু বৃদ্ধা হয়ে দাঁড়ালেন তার জীবনের এক অবিভাজ্য অঙ্গ।

সে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষা করবার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল এই পক্ষাঘাতগ্রস্তাকে! যখনই বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায় সে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরত সেই মৃতবৎ পিসীকে। কেঁদে ককিয়ে শ্রান্ত হয়ে থামত শেষে।

"আমি অত্যন্ত হতভাগিনী, দয়া করো আমায়" কাঁদতে কাঁদতে বিড়বিড় করতো সে। "তোমায় ঠকিয়েছি, তোমার ছেলেকে ঠেলে দিয়েছি মৃত্যুমুখে। তুমি কখনই আমায় ক্ষমা করতে পারবে না........। যদি বুক চিরে দেখাবার হত ত দেখাতাম কি অনুশোচনার জ্বলে অছে আমার বুকটা। কি দুঃখে কাল কাটাচ্ছি, তা জানতে পারলে নিশ্চই দয়া হত তোমার! আমায় ক্ষমা করতে তাহলে।........না, না, তোমার করুণা চাই না........আমায় মরতে দাও তোমার পায়ের তলে।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে আশা নিরাশায় দোদুল্যমান চিত্তে কাঁদত এইভাবে। অনুশোচনার ঘোরে কখন কখন ভুলেই যেত সে কাঁদছে মাদাম রাকুয়াঁকে ধরে। মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নের ঘোরে কাঁদত যেন সে। কিছুক্ষণ

কান্নার পর মনটা একটু শান্ত হলে আসত নেমে। আবার অনুশোচনার দাহ শুরু হলেই ছুটে যেত ওপরে। শুরু হত সেই পুরাতন অভিনয়।

তার অশ্রুজলের অভিনয় পিসীর মনে যে কি অসহ্য জ্বালা ধরাত সে খবর রাখবার অবকাশ ছিল না থেরেসার। এর চেয়ে জঘন্য, এর চেয়ে মর্মান্তিক যাতনার কথা কেউ ভাবতে পারে না কোনদিন। স্থাণু মৃতবৎ পিসীর চোখে এ অনুশোচনার ভণ্ডামী ধরা পড়ে গোড়া থেকেই। তাই এত অসহ্য ছিল ভাইঝির করুণা ভিক্ষার ভাণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই নাকে কান্না শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যেতেন তিনি। ক্ষমা করতে পারবেন না—সকল ক্ষমার অযোগ্য বীভৎস অপরাধে অপরাধী তারা। শুধু প্রতিশোধের শাণিত ছুরিকা শানাচ্ছিলেন তিনি নিজের মনে আর অনুসন্ধান করছিলেন উপযুক্ত সুযোগের। কখনো ভাবতেন, কে জানে হয়ত দুষ্কৃতিকারীদের পরিকল্পনার একটি অঙ্গ হিসেবে তারা এ নিষ্ঠুর যাতনা দিচ্ছে তাঁকে।

অবশেষে একদিন সাহসে ভর করে থেরেসা চুমু খেল তাঁকে। অনুশোচনার নিগ্রহের পর ভান করল পিসীর চোখে ক্ষমার শান্ত সমাহিত ছায়া সে দেখেছে। হাঁটু গেড়ে বসে ছিল এতক্ষণ। এবার উঠল সোজা হয়ে। আকুল আবেগে বলল "ক্ষমা করলে! পিসী আমায় ক্ষমা করলে?" তারপর বর্ষণ করল চুম্বনধারা বৃদ্ধার মুখে, চোখে, কপালে। এ পঙ্কিল স্পর্শ এড়াবার মত মাথা হেলাবারও সাধ্য ছিল না মাদাম রাকুঁয়ার। তাই নীরবে সইতে হল ভাইঝির মর্মান্তিক কাপট্য।

অসহ্য হলেও এ অভিনয় সহ্য করতে হল মাদাম রাকুঁয়াকে। অবলা, বাকশক্তিহীনা পঙ্গু বৃদ্ধার বুকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলেও নীরবে অশ্রু মোচন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ক্যামিলাসের হত্যাকারীদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র তিনি। থেরেসার কপট আচরণ পীড়া দিত তাঁকে সবচেয়ে বেশী। সে কাছে এলে চোখে ফুটিয়ে তুলতেন তীব্র ঘৃণার ছায়া আর

প্রতিবাদের ভঙ্গী। কিন্তু সে দৃষ্টি গায়ে মাখত না থেরেসা। নিজের খেয়ালে বসে কাঁদত; আদর করত তার পঙ্গু পিসীকে।

পিসীর সামনে হাঁটগেড়ে অভিনয় করতে করতে দিলে একদিন লরাঁ হ্যাঁচকা টানে উঠিয়ে দিল তাকে। বলল, "এ অভিনয়ের কি দরকার? আমি কি যেখানে সেখানে কেঁদে বেড়াচ্ছি এমন করে?........আমায় জ্বালাবার জন্যই করছ এ শয়তানী।"

থেরেসার অনুশোচনায় সে বিব্রত বোধ করল ভয়ানক। সহকারীর এই ভাব বিপর্যয়ে অসহায় বোধ করতে লাগল সে। থেরেসার জীবন্ত অনুশোচনার দিকে নজর পড়তেই বিভীষিকার আতঙ্ক যেত বহুগুণ বেড়ে। আশংকা হল হয়ত একদিন এই অনুশোচনার ঘোরে সে গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে দিতে পারে। তার চেয়ে ঝগড়া-ঝাটি করা ছিল ঢের ভাল। ঝগড়া-ঝাটিও ক্রমেই সাংঘাতিক হতে লাগল এখন থেকে।

থেরেসা বলে, "শোন, আমরা দুজনে যে পাপ করেছি তার জন্য অনুশোচনা না করলে মনে শান্তি আসছে না।........কাঁদতে শুরু করা অবধি আমার মন অনেক হালকা হয়ে গেছে।.......

লরাঁ খেঁকিয়ে ওঠে, "তোমার ইচ্ছে কর গিয়ে—আমার কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করে কেঁদো না। তোমার স্বরূপ জানতে আর আমার বাকী নেই।"

অনুশোচনাই নয় শুধু; থেরেসা এখন প্রায়ই তুলত ক্যামিলাসের কথা।

"কি ভালই ছিল সে! কোনও দিন সে কারও কোন ক্ষতি করেনি। এমন ভাল লোককেই কিনা মারলাম আমরা শেষে।"

থেরেসার মুখে ক্যামিলাসের প্রশংসার বাণী অসহ্য ঠেকল লরাঁর কাছে। সে ঝাঁজিয়ে উঠল।"

"ভাল ছিল, না? বল যে ছিল গবেট ....মনে নেই যে বলতে তার

কথা শোনা মাত্র গায়ে জ্বালা ধরত তোমার? এমন নীরেট হালচাল ছিল তার?"

"থাম থামো রসিকতা করতে হবে না। মেয়েদের মনের কথা কি বুঝবে তুমি? ক্যামিলাস আমায় ভালবাসত আমিও ভালবাসি তাকে।"

"তুমি ভালবাসতে তাকে? সত্যিই ত! তাকে না ভাল বাসলে আর আমার সঙ্গে কেন খেলবে প্রেমের খেলা? মনে পড়ে সেদিনের কথা? আমার বুকের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলেছিলে ক্যামিলাসের গায় হাত পড়লেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে তোমার?"

"না, না, তাকে ভালবাসতাম বোনের মত। আমার রক্ষাকর্ত্রীর ছেলে ছিল সে। দুর্বল স্বভাবের হলেও বহুগুণই ছিল তার মধ্যে! তাকেই খুন করলাম আমরা! হায় বিধাতা!"

কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছা গেল থেরেসা। আর একদিনও অমনি ঝগড়া সুরু হল,

"যা ইচ্ছে বল না কেন"—আরম্ভ করল থেরেসা অন্য কথার জের ধরে। তখন হয়ত তাকে তেমন করে ভালবাসতে পারিনি....এখন মনে পড়ে তার কথা। সত্যিই তাকে ভালবাসি....তোমায় করি ঘৃণা—তুমি হলে খুনী!...."

"থামবে কিনা"—চেঁচিয়ে উঠল লরা।

"আর সেই কিনা হল তোমার বলি! অমন গোবেচারীকে খুন করল এক গুণ্ডা।....নিজের কথা তুমিই ভাল করে জান—কেমন নির্মম পাষণ্ড দয়া মায়াহীন তুমি তাও বলতে হবে আমাকে! ক্যামিলাস কত ভালবাসত আমায়।...."

"গোল্লায় যাও—থামতে কিনা বল?" আবার গর্জে উঠল লরা।

"কেন থামব? সত্যি কথা বলছি অত ভয় কিসের? উঃ, কি

যাতনায় যে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে অহর্নিশি—এক খুনীর হাতে মারা পড়ল আমার অমন সোনার মত স্বামী।”

রাগে ক্ষোভে পাগল পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লরাঁ থেরেসার উপর। মাটিতে ফেলে দিয়ে হাঁটু-ডলা করে মারতে তুলল হাত।

“ঠিক হয়েছে, আমার উপযুক্ত শাস্তিই হচ্ছে। খুব মারো আমায়,”—বিকৃত কণ্ঠে বলল থেরেসা সেই অবস্থায়। অসহ্য আক্রোশে লরা দু-দুবার গেল তাকে গলা টিপে মারতে—! কীল চড় ঘুষির আঘাতেও থেরেসা থামল না একবার। আরও উস্কে দিতে লাগল লরাঁকে! এই অত্যাচারের নিকষ খাদে যদি জ্বলে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে সে! নতুন সান্ত্বনার আশ্রয় খুঁজে পেল এবার লরাঁর অত্যাচারে। লরাঁর কিল-চড়, লাথি বর্ষণে প্রতিশোধ-স্পৃহ মাদাম রাকুঁয়া ফেটে পড়ছিলেন আনন্দে।

এখন থেকে তাদের সকল ঝগড়া-ঝাটিরই অবসান হতে লাগল কিল চড় লাথিতে।

আঠাশ

দুষ্কৃতিকারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন মাদাম রাকুঁয়া ঠিক করলেন না খেয়ে মরে এদের হাত থেকে নিস্তার পাবেন। এদের দুজনের এই অসহ্য ভণ্ডামী তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। মৃত্যুই একমাত্র মুক্তির পথ বলে মনে হল তাঁর। পুরো দুদিন তিনি কিছুই খেলেন না। যেটুকু জোর ছিল অবশিষ্ট, তাই দিয়ে দাঁত কপাটি মেরে পড়ে থাকলেন। মুখে কিছু গেলেই থু থু করে ফেলে দিতেন। হতাশায় নেতিয়ে পড়ল থেরেসা। পিসীর অবর্তমানে সে কার কাছে কাঁদবে? মনের কথা বলে বুকের বোঝা কমাবে কার কাছে? কত বোঝাতে চেষ্টা করল তাঁকে। কিন্তু মাদাম রাকুয়াঁর প্রতিজ্ঞা অটল।

লঁরা এ ব্যাপারে রইল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বরঞ্চ থেরেসার কাণ্ড-কারখানা দেখেই সে হচ্ছিল আশ্চর্য! তার কাছে বৃদ্ধার উপস্থিতির আবশ্যকতা গিয়েছিল ফুরিয়ে। তাই তাঁর মৃত্যুর জন্য মোটেই আফশোস্ ছিল না তার মনে। হয়ত একদিন এমনিতেই মেরে ফেলতে হত তাকে! স্ত্রীকে তাই ধমকে উঠল,

"ছেড়ে দাও না ওঁকে—উনি মলেই বাঁচা যায়..."

লরঁার এই কথায় ভাবান্তর ঘটল মাদাম রাকুঁয়ার। জানেন, তিনি মারা গেলে সত্যি সত্যি এরা সুখের মুখ দেখবে, শান্তিতে থাকবে তাঁর সন্তানের হত্যাকারীরা। অথচ এই মর্মন্তুদ নাটকের শেষ অধ্যায় না দেখে যেতে তাঁর মন উঠছিল না। আত্মহত্যা করা আর হয়ে উঠল না তাঁর। ভাইঝির হাতের খাবার গ্রহণ করলেন অবশেষে।

বেশ বুঝতে পারলেন মনে মনে এদেরও শেষ ঘনিয়ে এসেছে। প্রতি-দিনই স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া হয়ে উঠছিল খরতর। এখন সারাদিনই লেগে থাকত তাদের মারামারি কাটাকাটি। এ-সমস্যা সমাধানের কোনও পথ খুঁজে পেল না কেউ। তবে কি পালিয়ে যাবে তারা? পালিয়েই বা নিস্তার কোথায়? সবাই তাহলে করবে সন্দেহ—উঁচিয়ে উঠবে গিলো-টিনের খাঁড়া তাদের মাথায়।

সকালে লঁরা বেরিয়ে গেলে থেরেসা শুধু খাবার ঘর আর দোকান-ঘরে ঘুরঘুর করে। বুঝতে পারে না কি করে কাটাবে সময়। অবশেষে থাকতে না পেরে ডেকে পাঠাল সুজানকে। তাকে আটকে রাখতে লাগল সারা দুপুরটা।

ঘরের এম্‌ব্রয়ডারীর কাজ নিয়ে এসে সে খুটখুট করে দোকানে বসে সেগুলো বুনে শেষ করত। তার গল্পে বিরক্ত ধরে যেত থেরেসার—ঘর-কন্নার টুকিটাকী গল্প কি ভাল লাগে তার!

ধীরে ধীরে তাদের সব খরিদ্দার চটে গেল। দোকানে এলে কেউ

আর তেমন ভাল ব্যবহার পায় না কারুর কাছে। জিনিসপত্তরও থাকে কম। খদ্দের এসে ফিরে চলে যায় মনের মতন জিনিস না পেয়ে।

এতদিনে টান পড়ল সেই জমানো চল্লিশ হাজার ফ্রাঁর ওপর। থেরেসা প্রায়ই বেরিয়ে যেত কোথায়। সারা বিকেল থাকত বাইরে বাইরে। বাইরে যাবার সময় সুজানকে বসিয়ে রেখে যেত দোকানে। সন্ধ্যেয় অবসন্ন-পায়ে ফের্‌বার সময়ও দেখত সে বুনছে।

বিয়ের পাঁচমাস পরে আর একটি প্রচণ্ড আঘাত পেল থেরেসা।

লরাঁর সন্তান তার গর্ভে! লরাঁর সন্তানের মাতৃত্বের কথা ভাবতেই কেমন সারা গা রী রী করে উঠল তার। অঙ্কুরেই সে তাকে বিনাশ করতে কৃতসঙ্কল্প হল। স্বামীকে কিছুই বলল না। তারপর একদিন সে যখন রুদ্রমূর্তিতে লাথি মারছিল তাকে, থেরেসা এগিয়ে দিল তলপেটটা! লরাঁর প্রচণ্ড পদাঘাতে ককিয়ে উঠল থেকে থেকে। মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে গেল তাকে লরাঁ। পরদিনই গর্ভপাত হল তার।

লরাঁর জীবন ছিল আরও বিষময়—বর্তমানের আশাও যেমন নাই তেমনই নেই ভবিষ্যতের কোনও ভরসা! ভবিষ্যৎ অন্ধকার হলে—বর্তমান হয়ে ওঠে আরও দুর্বিসহ। অভ্যাস বশে ষ্টুডিওতে গেলেও বুরুশ ছুঁতো না একবারও। হাত পা ছেড়ে সটান শুয়ে থাকত শুধু সেখানে। বিকেলে কিছুই করার থাকত না। পাগল পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াত ইতস্তত। কোথাও ছিল না আনন্দের লেশ, নির্বান্ধব, নিরানন্দ জীবনের পরিবেশে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল তার।

ক্ষণিকের আনন্দ পেত সে থেরেসাকে নির্মম প্রহারে জর্জরিত করে। লরাঁর দুর্বলতম স্থান ছিল ক্যামিলাসের কামড়ের দাগ। আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ত সে ঐ কথা মনে হলে। সেজন্যে থেরেসাও মারামারির সময় আপ্রাণ চেষ্টা করত সেই ক্ষতস্থানে আঁচড়ে-কামড়ে দিতে। কখনো এমন জোরে নখ ফুটিয়ে দিত সেখানে যে চীৎকার করে উঠত লরাঁ।

কামড়ের দাগে হাত পড়লেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠত—লরাঁকে আরও রাগিয়ে দেবার জন্য। ক্যামিলাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দগ্ধে মারত লরাঁকে, প্রতিশোধ নিত এ অকথ্য নির্যাতনের।

বাড়ীর সবকিছুই বিষময় হয়ে উঠল লরাঁর চোখে। হুলো বেড়াল ফ্রাঁসো পর্যন্ত হল দুচোখের বিষ। থাকতে না পেরে তাকে একদিন জানালা দিয়ে ছুঁড়েই ফেলল লরাঁ। মৃত্যু পথযাত্রী ফ্রাঁসোয়ার আর্ত-ক্রন্দনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন মাদাম রাকুঁয়া। কিন্তু কি করবেন, তিনি! একটার পর একটা নতুন উপসর্গ জুটছে লরাঁর। স্ত্রীর হাবভাবেও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে সে।

আরও গম্ভীর হয়েছে থেরেসা। আর সে অনুশোচনার কান্নায় অতিষ্ঠ করত না মাদাম রাকুঁয়াকে। পুরানো দিনের নিষ্ঠুর নির্মমতায় ফিরে গেল সে আবার। মনে হল অনুতাপেও শান্তি না পেয়ে যেন সে অন্য কোনও পথ ধরেছে। অথর্ব বৃদ্ধাকে দেখতে লাগল ঘৃণার চোখে। জীবনের কোন অর্থ খুঁজে না পেয়েই দুঃখের বোঝা তার গেল অনেক বেড়ে। বাইরে যাবার তাগিদ বাড়ল অনেক। সপ্তাহে চার পাঁচ দিনই যেতে শুরু করলো বাইরে।

এ পরিবর্তনে যেমন অবাক হল লরাঁ তেমনি ভয়ও লাগল একটু। আশংকা হ'ল, অনুশোচনার চাপে সে আবার সব কথা ফাঁস করে না দেয়! কোন কথাই বলত না সে এখন। দুবার সে চেষ্টা করছিল তাকে অনুসরণ করে দেখতে সে কোথায় যায়। কিন্তু দুবারই সে হারিয়ে গেছে ভীড়ে। ততই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে লরাঁ।

উনত্রিশ

একদিন সকালে ষ্টুডিও না গিয়ে লরাঁ চুপ করে বসে রইল রু গুয়েনে-গে'র শেষ প্রান্তের মদের দোকানে। সেখানে বসে নজর রাখল রু মাজারিণের পথচারীদের ওপর। থেরেসার দিকেই তার দৃষ্টি। গত রাতে তরুণী বলেছে, ভোরেই সে বেরিয়ে পড়বে—আর ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে একেবারে।

প্রায় আধ ঘণ্টা বসে রইল লরাঁ। স্ত্রী সব সময়ে রু মাজারিণ দিয়েই আসা যাওয়া করে, সে জানত। কিন্তু যদি সে রু দীলা সীন-এর পথে গিয়ে থাকে? একবার ভাবল দোকানে ফিরে গিয়ে পাসাজ-এর কোণায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। বসে থেকে থেকে যখন আর পারে না তখন হঠাৎ দেখল বেশ সেজেগুজে থেরেসা চলেছে যেন কোথায়। বেশ-ভুষার পারিপাট্য হয়েছে পারীর বারাঙ্গনাদের মত। লম্বা ফ্রীল দেওয়া স্কার্ট শুধু তার পরনে। পথে যেতে যেতে দেখছে চারিদিকের পথচারী-দের এমন কুটিল দৃষ্টিতে যে, যে-কোন লোকেরই মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। চলবার মুখে স্কার্টটা সময় সময় উঁচু হয়ে পায়ের উপর উঠে যাচ্ছে বেশ খানিকটা। রু মাজারিণ ধরে সে চলল। লরাঁও করল তার অনুসরণ। যারা সামনে থেকে দেখেছিল তাকে এবার তারা সবাই দেখতে লাগল পেছন থেকে। এবার রু দে লেকোল দে মেডিসিন ধরে চলেছে সে। লরাঁর ভয় হয় সে দিকে কাছেই যেন কোথায় পুলিশের ফাঁড়ি ছিল। নিশ্চয়ই তাহলে সে চলেছে স্বামীকে ধরিয়ে দিতে। তবে? না, সে সেখানে গেল না। পুরনো প্লাস সঁ্যা মিশেল-এ এসে সে হঠাৎ ঢুকে পড়ল এক কাফেতে। কোণার একটি টেবিলে আরও কয়েকজন মেয়ে-পুরুষের ভীড়ের মধ্যে গিয়ে বসেছে সে। সকলের সঙ্গেই

বেশ পরিচিতের মত গল্প করছে। তারপর হুকুম করল এ্যাবসিন্থ আনতে—চণ্ডুর মত ধূমেল নেশা করবে বোধ হয়।

বেশ স্বাভাবিক মনে হল তাকে। বহুক্ষণ অপেক্ষমান একজন তরুণের সঙ্গেই জমেছে তার গল্প বেশী। তুজন রূপোপজীবিনী এসে বসল তাদের পাশে। থেরেসার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ভাঙা গলায় তারাও গল্প শুরু করল। চারপাশে মেয়েরা সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে আর পুরুষেরা প্রকাশ্যেই জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে মেয়েদের। সেই কুৎসিত রসিকতা, কদর্য হাসি ঠাট্টার রেশ এসে বাজছিল লরাঁর কানে।

এ্যাবসিন্থ শেষ করে সুন্দর তরুণ-এর হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ল থেরেসা। রু দি লা হার্প ধরে চলেছে তারা। রু স্যা আন্দ্রে দে জার্টস্ অবধি লরাঁ তাদের পেছন পেছন গেল। সেখানে গিয়ে তারা ঢুকল একটা ফ্লাট বাড়ীতে। রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল লরাঁ। সেখান থেকে নজর পড়ত উপরে জানলার ধারে তার স্ত্রীর চেহারা। মুহূর্ত্তের জন্য জানলায় ভেসে উঠেছিল তার ছবি। মনে হল তার নিতম্ব বেয়ে নামছে তরুণের হাত তুটি। তারপর বন্ধ হয়ে গেল জানালা।

লরাঁ বুঝল সবই। আর দেরী না করে নীরবে ফিরে এল সে। আনন্দই হচ্ছিল তার। মন্দ নয়ত ব্যাপারটা! স্ত্রীর পদস্খলনে ব্যথা লাগেনি তার মনে এতটুকু। বরঞ্চ নিশ্চিন্তই হল যেন সে। থেরেসার কাছথেকে ভয় পাবার কিছু নেই বেশ বুঝতে পারল সে।

সেদিন সন্ধ্যায় সে ঠিক করল হাজার ফ্রা চাইবে স্ত্রীর কাছে। মন খারাপ হয়ে গেল একটু এই ভেবে যে, পুরুষের পক্ষে ব্যাভিচার হল ব্যয় বহুল আর মেয়রা কেমন সচ্ছন্দে করছে আত্মবিক্রয়।

একটু বেসামাল অবস্থায় ফিরল থেরেসা। কাপড়-চোপড় সব আগো-ছালো, সারা গায় কড়া চুরুটের গন্ধ। সারাদিনের অত্যাচারে, ক্লান্তিতে

অবসন্ন হয়ে ফিরল সে। নির্বাক পরিবেশে খাওয়া শেষ হল তাদের। থেরেসা কিছুই খেল না।

খাবার পর লরাঁ কোন ভনিতা না করেই চেয়ে ফেলল পাঁচ হাজার ফ্রাঁ।

"না, দেব না।" খেঁকিয়ে উঠল থেরেসা। "তোমায় লাগাম ছেড়ে দিলে আর রক্ষে থাকবে না আমাদের। দুদিনেই পথে বের করে দেবে ঠিক্।"

"হয়ত তাই হবে। তবু ওই টাকা আমার চাইই।"

"দেব না, দেব না, দেব না, হল ত! চাকুরী ছেড়ে দেবার পর থেকে ব্যবসাও উঠেছে লাটে। এখন সম্বল আমার যৌতুকের ঐ কটি টাকা। এবার নজর পড়ল বুঝি সেদিক। সে গুড়ে বালি। চার বছর ধরে বসে গেলাচ্ছি তোমায় মনে পড়ে না? নি-কাজী হুজুরের ত আমার ঘাড়ে চেপে বেশ হাত পা না নেড়ে সুখেই দিন কাটানোর ব্যবস্থা হয়েছে। যত সব....।

অনুক্ত কথাটিও সে উচ্চারণ করতে ছাড়ল না শেষ পর্যন্ত। লরাঁ ফেটে পড়ল হাসিতে। বলল, "ঠিক হয়েছে; যে দলে গিয়ে জুটেছো তাদের উপযুক্তই হয়েছে কথাটা। চমৎকার ভাষা শিখেছো হালের দোস্ত-দের কাছ থেকে।"

তিক্তকণ্ঠে থেরেসা জবাব দিল, "তারা অন্তত কেউ তোমার মত খুন-খারাবী করে নি।"

লরাঁ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এক মুহূর্ত দম নিয়ে বলে উঠল, "মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। এভাবে ঝগড়া করে কোন লাভই হবে না কারুর। দরকার আছে বলেই তোমায় পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিতে বলছি।"

"তা হবে না। যত যাই বল টাকা তোমায় দেব না কিছুতেই।" চেঁচিয়ে উঠল থেরেসা। "ভয় দেখিও না আমায়। তুমি যদি যেতে না

চাও ত আমিই যাব পুলিশে খবর দিতে। চোখ রাঙিয়ে আমায় সায়েস্তা করা এত সহজ নয়।"

বলেই চলতে শুরু করল। "বেশ চল", বলে লরাঁও চলল তার পেছনে। দোকানে এসে থামতেই দুজনে ফিরে তাকাল দুজনের দিকে। হিম হয়ে এল থেরেসার মেরুদণ্ড। সেই নরম হল আগে। বলল,

"কি লাভ এভাবে ঝগড়া-ঝাটি করে ; এতে লাভই বা হবে কার কি ; ও টাকা ত উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবে দু দিনেই। চাও ত এখনি দিতে পারি টাকাটা।"

বলে একটি ড্রাফট লিখে দিল তাকে। সে রাতে আর থানা-পুলিশের কোন কথা ওঠেনি তাদের মধ্যে।

পরদিন টাকা হাতে পড়তেই লরাঁ চলল রূপোপজীবিনীদের সন্ধানে। মাতলামী করে সারাদিন কাটিয়ে অবসন্ন লরাঁ গভীর রাত্রিতে বাড়ী ফিরল। কিন্তু তবু সোয়াস্তি কোথায় ? বারাঙ্গনার উত্তপ্ত চুম্বনে রীরংসা জাগল না ত তার ! চর্বচষ্যলেহ্যপেয় খেয়েও ত আনন্দ পেল না সে !

ভ্রষ্টানারীদেহেই বা কই সে মদিরতা ! বাড়ী ফিরে আবার মাদাম রাকুঁয়া আর থেরেসাকে দেখেই মনে পড়ল ক্যামিলাসের কথা। আবার সুরু হল সেই যন্ত্রনা ; সেই বিভীষিকার আতংক।

থেরেসাও যে মোহে ডুব দিয়েছিল যৌন ব্যাভিচারের কদর্য পংকে সে মোহ বিচ্যুতি ঘটতে বিলম্ব হল না বেশী। কোথায় বিস্মৃতি ! লাতিন পাড়ার মেয়েদের মতই সে ডুবেছে কলঙ্কের অতলে ; সঙ্গ দিয়েছে কত কামুককে। তবু শান্তি পায়নি ত সে কোন প্রেমিকের আলিঙ্গনে। পাঁড় মাতালের যেমন তীব্র থেকে তীব্রতর মদের চাহিদা হয় থেরেসাও তেমন চাচ্ছিল নিত্য নতুন রীরংসার খেলা। তারপর চরমে উঠে বিভ্রান্তি গেল ঘুচে। অবসন্ন হয়ে ছেড়ে দিল সে পংকিল পথ।

আবার মুখোমুখী দাঁড়াল হত্যাকারীরা নতুন করে। আর যেন

সংগ্রামের সাধ্য নেই তাদের। লাম্পট্যেও ধরে গেছে অরুচি—আর পথ কোথায় ?

আবার শুরু হল সন্ধ্যের ঝগড়াঝাটি, মারামারি কাটাকাটি। ভয় হল কে যেন কাকে দেবে ধরিয়ে। প্রায় কুড়ি বার তারা গেল থানার দরজা পর্যন্ত। আবার এল ফিরে। একবার যদি লরাঁ যায় ত তার পরই এগোয় থেরেসা। আর হবি ত হ দুজনেরই দেখা হয় পথে। সন্দেহ বাড়তে থাকে ততই দুজনের মনে।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কেউ কাউকে চোখের আড়াল করে না। সন্দেহের বশেই তারা পরস্পরের ঘৃণিত সাহচর্যে সময় কাটাতে বাধ্য হল। বিয়ের পর এত কাছাকাছি থাকেনি তারা কখনো। আর এত যাতনাও ভোগ করেনি এর আগে। থেরেসা দোকানে গেলে লরাঁও এসে বসে তার পেছনে পেছনে। লরাঁ পাসাজ-এ এসে দাঁড়ালে থেরেসাও দাঁড়ায় তার পাশে। দেখত সে কারুর সঙ্গে কথা বলছে কিনা। বিষ্যুৎবারের আসরে হত্যাকারীরা সন্ধির মিনতি ভরা দৃষ্টিতে জানাত একে অন্যের দিকে।

এ পরিস্থিতি আর ক'দিন চলতে পারে ?

বিভিন্ন পথে থেরেসা ও লরাঁ দুজনেই ফন্দী আঁটল এক নতুন অপরাধের। এক পাপ দিয়ে ঢাকতে চাইল অন্য পাপের কলঙ্ক। উভয়ের মাথাতেই এক সঙ্গে ঢুকল হত্যার আকাঙ্খা। খুন করবে তারা একে অন্যকে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। হত্যা পরিকল্পনায় কৃতসংকল্প হয়ে একটু শান্তি পেল যেন তারা। তারপরে শুরু করল হত্যাকাণ্ড সমাধানের পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে।

কয়েক সপ্তাহ আগে লরাঁর হঠাৎ দেখা হয় এক কলেজ-বন্ধুর সঙ্গে। তার ল্যাবরেটরীতে গিয়েও ছিল ক'বার। হত্যা পরিকল্পনার পর সে

লুকিয়ে প্রুসিক এ্যাসিড নিয়ে এল খানিকটা। বন্ধুর কাছে আগেই শুনেছে এর ভয়াবহ বিষক্রিয়ার কথা।

সেই দিনই লরাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে থেরেসা শাণ দিয়ে রাখল এক তীক্ষ্ণ ছোরায়। সাইড বোর্ডের কোণায় রাখল সেটা লুকিয়ে।

পরের বিষ্যুৎবারের আসরেও রাকুয়াঁ পরিবারের অতিথিরা এলেন যথারীতি। গৃহকর্ত্রীর যত্নের, ঘরদোর গুছিয়ে রাখার প্রশংসা করলেন অজস্র। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত চলল সে আসর।

সুজান ছিল অন্তঃসত্বা। থেরেসার সঙ্গে নানা গল্প করল সে। খুব মন দিয়ে শোনার ভান করল থেরেসা তার আবোল তাবোল গল্প।

গত চারবছর ধরে যতদিন তারা জমায়েত হয়েছে এই আসরে কারুর মনে ঘুণাক্ষরেও কোন সন্দেহ জাগেনি কি বীভৎস বিয়োগান্ত নাটকের ফল্গু প্রবাহ বয়ে চলেছে যবনিকার অন্তরালে। ইদানীং প্রহারের চিহ্ন নিয়ে দু একটি প্রশ্ন শুনতে হয়েছে মাত্র। লরাঁর হাতের দাগ যে ওগুলো একথা-স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাদের।

সভা ভেঙে গেলে সুজান জিজ্ঞেস করল থেরেসাকে "কাল সকাল নটায় আসব ত ?"

"না ভাই, কাল সকালে এসো না। হয়তো বাইরে যেতে হতে পারে তখন।" কেমন কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করল সে কথা কটি।

মাদাম রাকুয়াঁকে শুইয়ে দেবার সময় খাবার ঘর পরিষ্কার করে, সে এক গ্লাস সরবৎ তৈরী করে নিয়ে যেত তার ঘরে। সেদিনও উপরে এসে দুজনে বসলো মুখোমুখী। লরাঁ কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল "শুতে যাবে না ?"

"কেন যাব না ?" উত্তর দিল থেরেসা। সে উঠে জলের বোতল নিতে গেল সঙ্গে। তার স্বামী বলে উঠল, "থাকগে, তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। আমিই সরবৎ করে রাখছি।" বলেই টেনে নিল

বোতলটা তার হাত থেকে। গ্লাশ ভর্তি করে জল ঢেলে পাশ ফিরেই তার মধ্যে ঢেলে দিল সেই তীব্র বিষ আর চিনির টুকরো। ইতিমধ্যে থেরেসাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সাইডবোর্ডের পাশে। তুলে নিয়েছে ক্ষুরধার শাণিত ছোরা নিজের কাপড়ের ভাঁজে।

কি মনে হল—তুজনে ঠিক একই মুহূর্তে ফিরল পেছনে—তুজনের কাছেই ধরা পড়ল তুজনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কয়েক মুহূর্ত তারা তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে। তারপর থেরেসা আর লরাঁ তুজনেই ভেঙে পড়ল কান্নায়। অতীতের কথা মনে হতেই অবসন্ন চিত্তে চাইল এ জগত থেকে বিদায় নিতে।

শেষ দৃষ্টি বিনিময় হল তাদের মধ্যে একান্ত অনুগত, গভীর কৃতজ্ঞতার। সম্মুখে রইল পড়ে শাণিত ছোরা আর বিষের সরবৎ।

থেরেসা গ্লাশটা টেনে নিয়ে এক চুমুকে খেয়ে ফেলল অর্ধেকটা। বাকী অর্ধেকটা দিল এগিয়ে লরাঁকে। সে শেষ করল বাকীটা এ চুমুকে।

তারপরেই তারা ঢলে পড়ল তুজনে [illegible]র—তরুণীর [illegible] ঠোঁট গিয়ে ঠেকল স্বামীর ঘাড়ের কাছের সেই ক্ষত চিহ্নের সঙ্গে।

সারারাত পড়ে রইল মৃতদেহ তুটি খাবার ঘরে। মাদাম [illegible] রইলেন একমাত্র নির্বাক সাক্ষ্য। সার্থক প্রতিশোধের বিজয় গর্ব [illegible] পড়ছে সেই চকচকে চোখ তুটি থেকে।

শেষ